নগ্ন আওয়াজ

সা'দত
হাসান
মান্টো

নগ্ন আওয়াজ

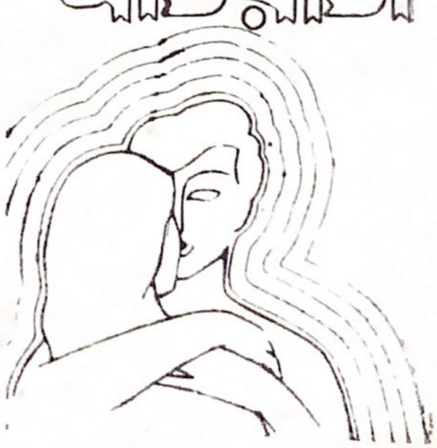

মূল ঃ

সা'দত হাসান মান্টো

নগ্ন
আওয়াজ

অনুবাদ ঃ

এ. বি. এম. কামালউদ্দিন শামীম

বুক সোসাইটি
৩৮/বাংলাবাজার/ঢাকা

প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৯

মূল্য ঃ ১০'০০ টাকা

প্রকাশনায় ঃ দেওয়ান আবদুল কাদের । ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণে ঃ সোসাইটি প্রিন্টার্স । ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ প্রাণেশ কুমার মণ্ডল

উৎসর্গ

জিনাত বিলকিস প্রীতু

জীবনের দুস্তর মরুভূমিতে যে দিয়েছে
স্নিগ্ধ-শীতল মরুস্থানের শ্যামলিমা
সেই অবুঝ-হৃদয় কিশোরীকে

প্রসঙ্গ-কথা

উর্দু কথা-সাহিত্যে সা'দত হাসান মাণ্টো যে এক বিস্ময়কর প্রতিভা, বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে এ-কথা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্পের যে সর্বজন-স্বীকৃত সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই মাপকাঠিতে বিচার করলে মাণ্টোর প্রতিটি গল্পই 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'-এর পর্যায়ভুক্ত। গল্প বলার এমন চিত্তাকর্ষক টেকনিক খুব বেশী ছোটগল্প লেখকের আয়ত্তের মধ্যে নেই। এই কারণেই মাণ্টোর গল্পে পাঠক এক অনাস্বাদিত স্বাদ খুঁজে পান। তাঁর গল্পের বেশ ক'টি সংকলন প্রকাশ পেলেও এখনো তাঁর অপ্রকাশিত গল্পের সংখ্যা কম নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'নগ্ন আওয়াজ' সংকলনের গল্পগুলো মাণ্টোর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের মাণ্টো-প্রীতি আরো বাড়িয়ে দেবে।

—অনুবাদক

সূচীপত্র

খালি বোতল খালি ডিব্বা ৯
টুটু ১৯
সাহায়ে ২৭
রাম খেলাওন ৩৫
বিসমিল্লাহ ৪৫
শান্তি ৫২
মজিদের অতীত ৬৩
দুই জাতি ৭১
খালেদ মিঞা ৮১
গ্রন্থসার ৯১
নয়া আওয়াজ ১০১

পড়ার মতো কয়েকটি বই

ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং
দু'টি উদাস চোখ
চাঁদ, হে চাঁদ
ফুলে ফুলে খুঁজে ফেরে
ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ
এবং আলো এবং আঁধার
রক্তের মত লাল
প্রেমেশ্বরী
নির্মলা
মাটির প্রেম
এজেণ্ট এফ. বি. আই
বাবু গোপীনাথ
হংকং-এ একরাত
নির্বাচিত আরবী গল্প
লাভ স্টোরি

শয়তানের পদত্যাগ
পাঁচ গুণ্ডা এক নায়িকা
সুন্দর পৃথিবী
দু'ফোঁটা পানি
মান্টোর অপ্রকাশিত গল্প
স্বর্গের শেষ ধাপ
এক লায়লা হাজার মজনু
শহীদ
দরোজা খুলে দাও
সেই মেয়েটি
প্রথম স্ত্রী
আর পাবো না ফিরে
নগ্ন আওয়াজ
প্রেমের নাম বেদনা
এস মরি

খালি বোতল খালি ডিব্বা

বিশেষত চিরকুমার লোকদের খালি বোতল এবং খালি ডিব্বার প্রতি এতো আসক্তি কেন? আমি এ নিয়ে এখনো বিস্মিত হচ্ছি। চিরকুমার বলতে আমি সেসব লোকের কথাই বোঝাতে চাই বিয়ের প্রতি যাদের কোন আগ্রহ দেখা যায় না।

এমনিতে এ ধরনের লোক অনেক অদ্ভুত অভ্যাসের অধিকারী হয়, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, খালি বোতল এবং খালি ডিব্বার প্রতি তাদের ভালোবাসার এতো মাত্রাধিক্য কেন? পশু এবং পাখী তাদের গৃহপালিত জীব হতে দেখা যায়, এদের সাথে সময় কাটিয়ে তারা হয়তো আনন্দ লাভ করে, কিন্তু খালি বোতল এবং খালি ডিব্বা তাদের কি এমন দুঃখ হরণ করতে পারে?

বিচিত্র সব অভ্যাসের কারণ ব্যাখ্যা করে বলা যায়, প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত নিয়মের বিরোধিতাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। এর মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করা অবশ্য বেশ কষ্টকর।

আমার একজন আত্মীয় আছেন, তার বয়েস প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি। কবুতর পালনের খুব সখ। এটা কোন অবাক হওয়ার মত ব্যাপার নয়, কিন্তু তার একটা রোগ হলো, বাজার থেকে তিনি দুধের সর কিনে আনবেন তারপর সেসব চুলোর উপরে চাপিয়ে গরম করে এক ধরনের খাবার তৈরী করবেন। তার ধারণা, এভাবে খাঁটি ঘি তৈরী করা যায়। পানি পান করার জন্যে রাখা নিজের কলসী তিনি কাউকে ছুঁতে দেন না। কলসীর মুখে তিনি এক টুকরো মলমল চাপিয়ে রাখেন, যাতে করে ভেতরে বাতাস প্রবেশ করবে, কিন্তু পোকা-মাকড় যেন কিছুতেই প্রবেশ করতে না পারে। পায়খানায় যাওয়ার সময়ে তিনি সব জামাকাপড় খুলে কোমড়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নেন এবং একজোড়া কাঠের স্যাণ্ডেল পরিধান করেন। এখন

বলুন এর এসব মেনিয়া সম্পর্কে কে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা করতে বসবে?

আমার এক চিরকুমার বন্ধু হাইকোর্টের কোর্ট রীডার। আপাত দৃষ্টিতে স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু সব সময়ে সব কিছু থেকে তিনি দুর্গন্ধ অনুভব করেন। ফলে তার নাকে সব সময় একটা রুমাল চাপা দেয়া থাকে। তার খরগোস পালনের খুব সখ।

অন্য একজন চিরকুমার আছেন সুযোগ পেলেই তিনি নামাজ পড়তে শুরু করেন। কিন্তু তার মাথা ও মগজ সম্পূর্ণ সুস্থ, তাতে কোন দোষ নেই। তিনি বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। তোতা পাখীকে কথা শেখানোর ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী।

মিলিটারির একজন বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত মেজরকে আমি জানি, তিনি বেশ বিত্তশালী। তার সখ হলো যতো রকমের হুঁকো আছে, সব তিনি জমা করবেন। তিনি অনেকগুলো বাড়ীর মালিক, তবু হোটেলের একটা কামরা সব সময়ের জন্যে ভাড়া করে রাখবেন।

অবসরপ্রাপ্ত একজন ক্যাপ্টেনকে আমি চিনি, বিরাট একটা বাড়ীতে তিনি দশ৽বারোটা কুকুর সহ বাস করেন। সব রকম মদ তার কাছে সব সময় মজুদ থাকে। প্রতিদিন বিকেলে তিনি তিন পেগ মদ পান করেন এবং নিজের সাথে বসিয়ে কোন একটা আদরের কুকুরকেও পান করান।

এ যাবত আমি যে ক'জন চিরকুমারের কথা উল্লেখ করলাম, এদের প্রত্যেকেরই কিন্তু খালি বোতল এবং খালি ডিব্বার প্রতি সাধ্যমাফিক আকর্ষণ রয়েছে। দুধের সর দিয়ে খাঁটি ঘি তৈরী করাতে অভ্যস্ত আমার সে আত্মীয় ঘরে কোন খালি বোতল পেলেই সেটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আলমারিতে সাজিয়ে রেখে ভাবেন, প্রয়োজনের সময় কাজে আসবে। হাইকোর্টের রীডার, যিনি সব সময় সব স্থানে দুর্গন্ধ খুঁজে পান তিনি খালি বোতল সমূহ সাজিয়ে রাখার আগে সেসব বোতলের দুর্গন্ধহীনতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েই তা সাজান। সময় পেলেই যিনি নামাজ পড়েন, তিনি হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে খালি বোতল এবং ওজু করার জন্যে টিনের খালি ডিব্বা ডজনে ডজনে সাজিয়ে রাখেন। তার ধারণা, এ দুটো জিনিস সস্তা এবং পবিত্র থাকে।

সব ধরনের হুঁকো সংগ্রহকারী মেজর সাহেবের সখ হলো খালি বোতল এবং খালি ডিব্বা জমা করে তিনি সেগুলো বিক্রি করেন। অবসর-প্রাপ্ত কর্নেল সাহেবের সখ হলো, তিনি শুধু হুইস্কির খালি বোতল জমা করবেন। কর্নেল সাহেবের বাড়ীতে গেলে আপনি কয়েকটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কামরায় কাচের কয়েকটি আলমারিতে হুইস্কির অসংখ্য খালি বোতল সাজানো দেখতে পাবেন। অনেক পুরনো ব্রাণ্ডের হুইস্কির বোতল সেসব আলমারিতে পেয়ে যাবেন। বিভিন্ন দেশের টিকেট এবং অর্থ জমা করার যেমন কারো কারো সখ থাকে ঠিক তেমনি এদের সখ হলো খালি বোতল জমা করা এবং সেগুলোর প্রদর্শনী করা।

কর্নেল সাহেবের কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, থাকলেও আমি জানি না। পৃথিবীতে তিনি একান্ত একা। কিন্তু তিনি কখনো একাকীত্ব অনুভব করেন না। স্নেহময় পিতার মতোই তিনি নিজের দশ-বারোটি কুকুরের দেখাশোনা করেন, তত্ত্বাবধান করেন। প্রায় সারাদিন তিনি এসব পশুর সাথে কাটিয়ে দেন। বাকি যে সময় থাকে সে সময়ে আলমারিতে সাজানো বোতল নতুন করে সাজান।

আপনারা প্রশ্ন করবেন যে, খালি বোতলের কথা তো বুঝলাম কিন্তু তুমি খালি ডিব্বার কথাও বলছ কেন? চিরকুমার লোকদের খালি বোতলের সাথে খালি ডিব্বাও পছন্দ হতে হবে এমন কোন কথা আছে নাকি? তাও ডিব্বা এবং বোতল দুটোই খালি কেন, ভরা কেন নয়? আপনাদের কাছে আমি সম্ভবত আগেই বলেছি যে, এদের ব্যাপারে আমার বিস্ময়ের অবধি নেই। এ ছাড়া আমার মাথায় অনেক প্রশ্ন জেগেছে, চেষ্টা করেও আমি সেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাইনি।

খালি বোতল এবং খালি ডিব্বাকে যদি শূন্যতার প্রতীক বলে ধরে নেয়া হয়, যদি নীতিগতভাবে ধরে নেয়া হয় যে, তাদের ব্যক্তিজীবনে শূন্যতার মোচনেই শূন্য জিনিসের প্রতি তাদের এ আকর্ষণ তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, একটা খালি বা শূন্যাবস্থা কি অন্য খালি বা শূন্যাবস্থার পরিপূরক? কুকুর, বিড়াল, খরগোস এবং বানর সম্পর্কে

বলা যায় যে, এগুলো মানব জীবনের নিঃসঙ্গতা অনেকটা ভুলিয়ে দিতে পারে, চিত্তবিনোদনের কিছুটা উপকরণ হতে পারে, খেলাধুলার সাথী হতে পারে, আদর সোহাগ কেড়ে নিয়ে ক্ষণিকের জন্যে মন ভোলাতে পারে—কিন্তু এই খালি বোতল এবং খালি ডিব্বার মধ্যে মনোরঞ্জনের কি উপকরণ রয়েছে ?

নিম্নে বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে খুব সম্ভব এসব প্রশ্নের জবাব আপনারা পেয়ে যাবেন।

দশ বছর আগে আমি যখন বোম্বে গিয়েছিলাম তখন সেখানে এক ফিল্ম কোম্পানীর একটা ছবি বিশ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রদর্শিত হচ্ছিল। নায়িকা ছিল পুরনো কিন্তু নায়ক ছিল নতুন। বিজ্ঞাপনে নায়কের ছবি দেখেই বোঝা যায় যে এ চেহারা নতুন আমদানী হয়েছে। সংবাদপত্রে নায়কের প্রশংসা দেখে ছবিটি আমি দেখলাম। ছবিটা ভালোই। কাহিনী আকর্ষণীয়। নতুন নায়ক প্রথমবার ক্যামেরার সামনে এসেও যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে।

চলচ্চিত্রের পর্দায় নায়ক-নায়িকার বয়স অনুমান করা মুশকিল, কারণ মেক-আপ বৃদ্ধকে যুবক এবং যুবককে বৃদ্ধ বানিয়ে দেয়। কিন্তু নতুন নায়ক নিঃসন্দেহে যুবক, কলেজের ছাত্রের মত সজীব এবং চৌকশ। সুদর্শন বলা যায় না বটে তবে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহের গঠন বিন্যাস দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো।

পরে এ নায়কের আরো কয়েকটি ছবি আমি দেখেছি। নায়কের চেহারার কোমলতা কমনীয়তা বয়স এবং অভিজ্ঞতার ছাপে কেমন যেন রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। উক্ত নায়ক তখন প্রথম শ্রেণীর নায়কদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

চিত্রজগতে স্ক্যাণ্ডেল একটা সাধারণ ব্যাপার। হঠাৎ করে কখনো শোনা যায় অমুক নায়কের সাথে অমুক নায়িকার অমুক নায়িকার সাথে অমুক নায়কের সম্পর্ক চলছে, অমুক নায়িকা অমুক নায়ককে ছেড়ে অমুক পরিচালকের কাছে চলে গেছে। প্রায় সব নায়ক নায়িকা সম্পর্কে রোমাঞ্চকর খবর চলচ্চিত্র সাময়িকীতে ছাপা হতো,

তার মধ্যে অসত্য খুব বেশী থাকত না। কিন্তু আমি যে নায়কের কথা বলছি সে নায়ক এসব ফিল্মী স্ক্যাণ্ডেল থেকে মুক্ত ছিল, অবশ্য এজন্যে সাময়িকীগুলোতে তাকে নিয়ে আলোচনাও হতো কম। চিত্রজগতে থেকেও রামস্বরূপ যৌন ব্যাপার স্যাপারে জড়িয়ে পড়েনি এটা অনেকের কাছে ছিল রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার।

সত্যি বলতে কি এ ব্যাপারে আমি কখনো চিন্তা-ভাবনা করিনি। কারণ নায়ক নায়িকাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিল না। ছবি দেখতাম, সে ছবি সম্পর্কে ভালো বা মন্দ একটা মতামত নিজের মনে পোষণ করতাম কখনো বা মন্তব্য করতাম, ব্যস ঐ পর্যন্ত। কিন্তু এই রামস্বরূপের সঙ্গে পরিচয় এবং আলাপ হওয়ার পর আমি তার সম্পর্কে অনেক মজার মজার কথা শুনতে পেলাম। রামস্বরূপের প্রথম ছবি দেখার আট বছর পর আমি তার সাথে মুখোমুখি আলাপ করি।

প্রথম দিকে রামস্বরূপ বোম্বে থেকে দূরে এক গ্রামে থাকতো, কিন্তু পরে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিবাজী পার্কে একটা মাঝারি ধরনের ফ্ল্যাট নিয়েছিল। তার সাথে সেই বাসায় আমি আলাপ করেছিলাম। চারটা কামরা, রান্নাঘর ইত্যাদি সহ বেশ পরিপাটি বাসভবন।

রামস্বরূপের বাড়ীতে আটটি প্রাণী বাস করতো। স্বয়ং রামস্বরূপ, তার চাকর, যে কি না বাবুর্চির কাজও করতো। তিনটি কুকুর, দুটি বানর, একটা বিড়াল। রামস্বরূপ এবং তার চাকর উভয়েই ছিল চিরকুমার। তিনটি কুকুর এবং একটি বিড়ালের যৌন সহচরী কেউ ছিল না। তবে দুটো বানর ছিল বিপরীত লিঙ্গের অধিকারী, তারা একটা বড় খাঁচার ভেতর স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতো।

এই আধডজন পশুর সাথে রামস্বরূপের ভালবাসা ছিল অপরিসীম। চাকরের সাথেও রামস্বরূপের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। কিন্তু এই আন্তরিক সম্পর্কের মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস বা আবেগ প্রবণতা ছিল না, নির্দিষ্ট সময়ে মেসিনের মতো সব কাজ হয়ে যেতো, মনো হতো যেন রামস্বরূপ তার জীবনের সবকিছু চাকরকে একটা কাগজে লিখে দিয়েছে,

চাকর সে কাগজের লেখা মুখস্থ করে নিয়েছে।

রামস্বরূপ বাইরের জামা-কাপড় খুলে ঘরোয়া সংক্ষিপ্ত পোষাক পরিধান করার সাথে সাথে চাকর ত্রস্তহাতে তিন-চারটে সোডা এবং বরফের বোতল টেবিলের উপর সাজিয়ে দিত। এর অর্থ হলো সাহেব রামি পান করে কুকুরদের সাথে খেলা করবেন। এ সময়ে বাইরে থেকে কারো টেলিফোন এলে চাকর জানিয়ে দেবে—সাহেব এখন বাসায় নেই।

রামির বোতল বা সিগারেটের প্যাকেট খালি হলে সেগুলো বাইরে ফেলে দেয়া বা বিক্রি করা হবে না বরং স্তূপীকৃত খালি বোতল এবং ডিব্বার সাথে সেগুলো জমা করা হবে।

কোন মেয়ে দেখা করতে এলে তাকে দরজা থেকেই এই বলে বিদায় করা হবে যে রাতে সাহেবের স্যুটিং ছিল, এজন্যে এখন তিনি ঘুমুচ্ছেন। আপনি বিকেলে অথবা রাতে আসুন। তখন এলে বলা হবে, সাহেব স্যুটিং-এ গেছেন।

যেসব চিরকুমার পুরুষ একাকী থাকে রামস্বরূপের বাসা তাদের চেয়ে কোন দিক থেকে পৃথক ছিল না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে চাকরদের সব সময় লক্ষ্য থাকতো কিন্তু সে পরিচ্ছন্নতায় মেয়ে-হাতের ছাপ না থাকায় সবকিছুতেই এক ধরনের উগ্রতা লক্ষ্য করা যেতো। প্রথম যেদিন রামস্বরূপের বাসায় প্রবেশ করেছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল আমি যেন একটা চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করেছি, সে রকমই গন্ধ পাচ্ছিলাম।

একটা কামরা শয়নের জন্যে, একটা কামরা বৈঠকখানা, আর একটা কামরায় শুধু খালি বোতল আর খালি ডিব্বা। মদের বোতল এবং সিগারেটের প্যাকেট রামস্বরূপ যেগুলো খালি করতো, চাকররা সেগুলো সযত্নে সাজিয়ে রাখতো। বোতলের উপর ডিব্বা ডিব্বার উপর বোতল এলোপাতাড়ি পড়ে থাকতো। একদিকের সারি পূর্ণ হলে অন্য দিক থেকে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হতো। কোন কোন বোতল থেকে রামির গন্ধ এবং সিগারেটের প্যাকেট থেকে বাসি তামাকের গন্ধ ভেসে আসতো।

প্রথমে সে কামরা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। অসংখ্য অগণিত বোতল এবং ডিব্বা। সবগুলোই খালি। রামস্বরূপকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ভাই, এ কেমন ব্যাপার ?

—কোন ব্যাপারের কথা বলছো ?

—এই—এই যে বিরাট কারখানা।

—জমা হয়ে গেছে।

—এতো ! এতোগুলো জমা করতে কমপক্ষে সাত আট বছর সময় লেগেছে।

আমার ধারণা ছিল ভুল। আমি পরে জেনেছিলাম, ওগুলো ছিল পুরো দশ বছরের সঞ্চয়। শিবাজী পার্কে বাসা বদল করার সময়ে আমি পূর্বেকার বাসার সব খালি বোতল এবং খালি ডিব্বা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম।

আমি বললাম, কি ব্যাপার, এগুলো বিক্রি করে দিচ্ছ না কেন? আমি বলতে চাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে দিলে না কেন? যুদ্ধের কারণে শূন্য বোতল ও ডিব্বা বেশী পেতে। এখন যে এতো জমা হয়ে গেছে। আমার মতে, এ ঝামেলা উঠিয়ে দেয়াই সমীচীন।

রামস্বরূপ জবাবে বলল, যেতে দাও ইয়ার। এসব বাজে বকোয়াস বাদ দাও।

এ কথা থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, খালি বোতল এবং খালি ডিব্বার প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু আমি চাকরের কাছে জেনেছিলাম, একটা বোতল বা একটা ডিব্বা এদিক থেকে ওদিক হলে রামসরূপ সারা বাড়ী যেন মাথায় তোলে।

মেয়েদের প্রতি রামস্বরূপের কোন আকর্ষণ ছিল না। তার সাথে আমি বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম। কথায় কথায় কয়েকবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিয়েশাদী করবে ?

প্রত্যেকবারই সে জবাব দিত, বিয়েশাদী করে কি করব ?

আমি শুধু ভাবতাম, আনলেই তো, রামস্বরূপ বিয়ে করে কি করবে ? সে কি নিজের বৌকে খালি বোতল এবং খালি ডিব্বার কামরায় বন্দী করে রাখবে না ! নাকি জামা কাপড় খুলে রেখে

আওারওয়্যার পরে তার সাথে খেলা করবে। তার সাথে বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে প্রায়ই আলাপ করতাম কিন্তু স্মৃতির উপর জোর দিয়েও কোন মেয়ের সাথে তার সম্পর্কের কথা মনে করতে পারতাম না।

রামস্বরূপের সাথে পরিচয়ের পর কয়েক বছর কেটে গেল। এক সময়ে উড়ো উড়ো খবর পেলাম শীলা নামে এক অভিনেত্রীর সাথে তার প্রেম চলছে। আমি এ গুজব বিশ্বাস করতে পারলাম না। একেত রামস্বরূপ সম্পর্কে এ ধরনের কথা চিন্তা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কোন সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন যুবক শীলার সাথে প্রেম করতে পারে না। কারণ শীলা এতো নিষ্প্রাণ, দেখে মনে হতো যেন ক্যান্সারের রোগী। প্রথম দিকে দু'একটা ভাল ছবিতে সে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু পরে সে তৃতীয় শ্রেণীর ছবির জন্যেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

শুধু একবার রামস্বরূপকে শীলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে মৃদু হেসে বলল, আমার জন্যে কি ও-ই রয়ে গেছে?

এই সময়ে রামস্বরূপের সবচেয়ে প্রিয় কুকুর স্টালিন মারাত্মক ভাবে নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হলো। রামস্বরূপ যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেও কোন কিছু করতে পারল না। কুকুরটি মারা গেল। কুকুরটির মৃত্যুতে রামস্বরূপ খুবই দুঃখ পেল। কয়েকদিন পর্যন্ত তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়লো। পরে একদিন বাকি কুকুরগুলো এক বন্ধুকে দিয়ে দেয়ায় আমি ভেবেছিলাম রামস্বরূপ স্টালিনের মৃত্যুর শোক সইতে না পেরেই অমন করেছে, তা না হলে সে কিছুতেই বাকি কুকুরগুলোর বিচ্ছেদ বেদনা সইতে পারতো না।

আরো কিছুদিন পর পোষা বানর দুটোকেও বিদায় করে দেয়ার পর আমি ভাবলাম, রামস্বরূপের মন আর কারো মৃত্যুশোক সইতে পারবে না, এজন্যে বানরদেরও বিদায় করে দিয়েছে! এরপর রামস্বরূপ আওারওয়্যার পরে তার প্রিয় বিড়াল নার্গিসের সাথে খেলা করতো। রামস্বরূপ বিড়ালটিকে খুবই ভালবাসতো। তার মনোযোগ সর্বতোভাবে বিড়ালের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

এরপর রামস্বরূপের ঘর থেকে বাঘ এবং চিতার গন্ধ আসতো

না। পরিচ্ছন্নতার মধ্যেও এক ধরনের রুচিবোধ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। রামস্বরূপের চেহারায়ও এক ধরনের তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। গভীরভাবে লক্ষ্য করার পরই সেটা ধরা পড়তো, বাহ্য দৃষ্টিতে বোঝার উপায় ছিল না।

দিন কাটতে লাগলো। রামস্বরূপের নতুন ছবি মুক্তি পেলে তার অভিনয়ে আমি এক ধরনের পরিপক্কতার ছাপ দেখতে পেলাম। এজন্যে তাকে অভিনন্দন জানালে সে হেসে বলল, নাও, হুইস্কি খাও।

আমি অবাক হয়ে বললাম, হুইস্কি?

অবাক হওয়ার কারণ হলো এর আগে রামস্বরূপকে সব সময় রামি পান করতে দেখেছি।

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে রামস্বরূপ জবাব দিল, রামি খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

আমি তাকে আর কিছু বললাম না।

এ সাক্ষাতের পর অষ্টম দিনে রামস্বরূপের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখি, সে পায়জামা কামিজ পরে রামি নয় হুইস্কি খাচ্ছে। আমরা উভয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাস খেললাম এবং হুইস্কি খেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, হুইস্কি মুখে দিয়ে রামস্বরূপ মুখ বিকৃত করছিল।

আমি বললাম, তোমার কি ভাল লাগছে না?

সে হেসে বলল, ধীরে ধীরে ভাল লাগবে।

রামস্বরূপের শয়নকক্ষ ছিল দোতালায়। একদিন তার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি, নীচে গ্যারেজের পাশে খালি বোতল এবং খালি ডিব্বা স্তূপাকারে পড়ে আছে। রাস্তায় দুতিনটে ছ্যাকড়া গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, দুতিনটে লোক বোতল এবং ডিব্বাগুলো গাড়ীতে তুলছে। আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। রামস্বরূপের খালি বোতল এবং খালি ডিব্বার বিশাল সঞ্চয়ের এ অবস্থা দেখে আমি মনে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করলাম। দ্রুত উপরতলায় গিয়ে দরজার কড়া নাড়লাম। চাকর দরজা খুলে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার পথরোধ করে বলল, সাহেব রাতে স্যুটিং-এ গিয়েছিলেন, এখন ঘুমুচ্ছেন। আমি রাগে এবং বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে ফিরে এলাম।

সেদিনই বিকেলে রামস্বরূপ আমার বাসায় এলো। তার সঙ্গে শীলা। পরিধানে নতুন বেনারসী শাড়ী। রামস্বরূপ তার প্রতি ইশারা করে আমাকে বলল, আমার ধর্মপত্নী।

যদি আমি তার আগে চার পেগ হুইস্কি না খেতাম তাহলে এ খবর শুনে নিঃসন্দেহে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তাম।

রামস্বরূপ এবং শীলা কিছুক্ষণ বসার পরই চলে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, বেনারসী শাড়ীতে শীলাকে কার মত লাগছিল। হালকা পাতলা দেহের সাথে কাগজের মত বাদামী রঙের শাড়ী মিশে আছে। কোন স্থানে ফাঁপা, কোন স্থানে খালি। হঠাৎ আমার সামনে সূক্ষ্ম কাগজে জড়ানো খালি বোতল এবং ডিব্বার চেহারা ভেসে উঠলো।

শীলা ছিল নারী—কিন্তু সম্পূর্ণ খালি—হতে পারে এক শূন্যতা হয়তো অন্য শূন্যতাকে পূরণ করে দিয়েছে।

◆

টুটু

বসে বসে ভাবছিলাম, পৃথিবীর প্রথম নারী যখন মা হয়েছিলেন তখন বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল?

পৃথিবীর প্রথম পুরুষ কি তখন আকাশের প্রতি জল জল চোখে তাকিয়ে পৃথিবীর আদি ভাষায় গর্বের সাথে বলেছিল, আমিও স্রষ্টা।

টেলিফোন বেজে উঠলো। ভাবনার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। ব্যালকনী থেকে উঠে ভেতরের কামরায় এলাম। টেলিফোন জেদী শিশুর মত চীৎকার করছিল।

টেলিফোন বড় উপকারী জিনিস। কিন্তু সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন চীৎকার শুরু করে এজন্যে আমি তাকে ঘৃণা করি। বিরক্তির সাথে রিসিভার তুলে বললাম, ফোর ফোর ফাইভ সেভেন।

ওধার থেকে শুধু হ্যালো হ্যালো করছে।

আমি রুক্ষস্বরে বললাম, কে?

—আমি ঝি।

—কাকে চাচ্ছো?

—মেম সাহেব আছেন?

—আছে ধরো।

টেলিফোনের রিসিভার একপাশে রেখে স্ত্রীকে ডেকে বললাম, মেম সাহেব, মেম সাহেব! স্ত্রী সম্ভবত ভেতরে শুয়েছিলেন। আমার কণ্ঠ শুনে হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে এসে বললেন, এ কি রকম রসিকতা? মেম সাহেব, মেম সাহেব।

আমি হেসে বললাম, মেম সাহেব কথাটাই ঠিক, মনে আছে তুমি তোমার ঝিকে বলেছিলে যে, আমাকে মেম সাহেব না বলে বেগম সাহেবা বলবে। তখন সেই ঝি বেগম সাহেবাকে বেগান সাহেবা বলে উচ্চারণ করেছিল।

হাসিমুখে আর একটা হাই তুলে আমার স্ত্রী বললেন, কে ডাকছে?

—জিজ্ঞেস করে দেখো।

আমার স্ত্রী টেলিফোনে হ্যালো হ্যালো শুরু করলেন। আমি ব্যালকনীতে চলে গেলাম। মেয়েরা টেলিফোনের ব্যাপারে দীর্ঘস্থুত্রিতার পরিচয় দেয়, এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলো না। পনের মিনিট পর্যন্ত আমার স্ত্রী হ্যালো হ্যালো করলেন।

আমি ভাবলাম, টেলিফোনে দু'একটা কথা বলার পরই এই হ্যালো হ্যালো বলা হয় কেন? এই হ্যালো বলার পেছনে কোন প্রকার হীনমন্যতাবোধ নেই তো! বারবার শুধু তারই হ্যালো হ্যালো বলা উচিত যে এ আশংকা করে যে তার নিষ্ফল অর্থহীন কথায় শ্রোতা বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে দিতে পারে, অথবা এটা নিছক একটা অভ্যাস।

আমার স্ত্রী ছুটে এসে বললেন, সাদত সাহেব, এবার তো ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস মনে হয়।

—কোন ব্যাপার?

সে ব্যাপারের প্রতি আলোকপাত না করে আমার স্ত্রী বললেন, কথা বাড়তে বাড়তে তালাক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। পাগলামিরও একটা সীমা আছে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না, কিছুটা সোরগোল হবে এই আর কি!

—আরে সাহেবা, কার কথা বলছেন?

—আপনাকে আমি বলিনি? ওহ হো, টেলিফোনে তাহেরা কথা বলছিল।

—তাহেরা, কোন তাহেরা?

—মিসেস ইয়াজদানী।

—ওহো বুঝেছি। নতুন কোন ঝগড়া হয়েছে?

—নতুন এবং বিরাট। যান, ইয়াজদানী সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

—আমার সাথে কি কথা বলবেন?

—জানি না। তবে মনে হচ্ছে, তাহেরার কাছ থেকে টেলিফোন কেড়ে নিয়েছে। আমাকে শুধু বলল, ভাবী, একটু মান্টো সাহেবকে দেবেন।

খামাখাই আমার মগজ চাটবে।—এই বলে আমি হ্যালো বলে ইয়াজদানীর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

সে শুধু বললো, ঘটনা মারাত্মক রূপ নিয়েছে। তুমি এবং ভাবীজান তাড়াতাড়ি ট্যাক্সী নিয়ে এসে পড়ো।

আমি এবং আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি পোষাক পাল্টে ইয়াজদানীর বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হলাম। পথে তাদের সম্পর্কে অনেক কথা হলো।

একজন খ্যাতনামা প্রেম-পেশা সঙ্গীতজ্ঞের মেয়ে তাহেরা। বেশ সুন্দরী। আতা ইয়াজদানী জাতে পাঠান। প্রথমে কবিতা লিখতো, তারপর নাটক, তারপর চলচ্চিত্রের কাহিনী। তাহেরার বাবা তখন অষ্টমবার প্রেমে পড়েছে। আতা ইয়াজদানী তখন আল্লামা মাশরেকীর খাকসার আন্দোলনের জন্যে ‘বেলিচা’ নামক একটা নাটক লিখছে।

একদিন বিকেলে প্যারেড করার সময়ে আতা ইয়াজদানীর সাথে তাহেরার চার বোনের মিলন হলো। সারারাত জেগে আতা চিঠি লিখে তাহেরাকে পৌঁছে দিল। কয়েক মাস উভয়ের মধ্যে পত্র বিনিময় হলো। তারপর একদিন অনাড়ম্বরভাবে তার বিয়ে হয়ে গেল। আতা ইয়াজদানীর অবশ্য একটা দুঃখ ছিল যে, তার প্রেম নাটকীয়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তাহেরাও নাটক পছন্দ করতো। প্রেম এবং বিয়ের আগে বান্ধবীদের সাথে স্যুটিং দেখতে গেলে ইয়াজদানীকে দেখে বলতো, বেঁটে লোক দেখলে তার হাত নিসপিস করতো। আমি ওর মাথায় এক মুঠো ধূলো নিক্ষেপ করবই, তোমরা যাই বলো না কেন?

বুদ্ধিমতী ছিল সে। একবার তার কাছে কোন পেটিকোট ছিল না। তখন সে কোমরের চারপাশে একটা কাপড় জড়িয়ে তার উপর শাড়ী পরিধান করে বান্ধবীদের সাথে বেড়াতে বের হলো।

তাহেরা কি আসলেই আতা ইয়াজদানীর প্রেমে পড়েছিল? এ সম্পর্কে নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলা যায় না। ইয়াজদানীর প্রথম প্রেমপত্র পাওয়ার পর সম্ভবত তার প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে, বেশ মজার

খেলা পাওয়া গেছে, চালিয়ে যাও। বিয়ের ব্যাপারেও তার প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটা এরকম। এমনিতে সে দৃঢ় চরিত্রের অধিকারিণী ছিল, কিন্তু জেদী হওয়ার কারণে স্বামীর সাথে প্রায়ই ঝগড় হতো। সম্ভবত এটাকেও সে একটা খেলা বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদের বাসায় পোঁছে দেখি ঘটনা আসলেই মারাত্মক রূপ নিয়েছে।

আমরা ঘরে প্রবেশ করতেই তাদের ঝগড়া আরো মারাত্মক রূপ নিল। তাহেরা এবং ইয়াজদানী উভয়ে উচ্চস্বরে পরস্পরকে গালাগালি করতে লাগলো। বাপ-দাদার নাম তুলে একে অন্যকে দোষারোপ করতে ছাড়ল না।

তাহেরার অভিযোগ হলো, আতা ষ্টুডিও পাড়ার এক বাজে অভিনেত্রীর সাথে ট্যাক্সিতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়।

ইয়াজদানী বলছে, এসব মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে অপবাদ।

তাহেরা কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত যে, উল্লেখিত অভিনেত্রীর সাথে আতার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তবুও আতার স্পষ্ট অস্বীকৃতিতে তাহেরা বলল, কতো সাধুসন্ত উনি, আচ্ছা ঐ যে ঝি দাঁড়িয়ে আছে। তুমি কি ওকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করোনি? ঠিক তখনই আমি উপর থেকে এসে পড়েছিলাম।

ইয়াজদানী গর্জন করে বলল, বাজে বকো না।

আবার উভয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করতে লাগলো।

আমি বোঝালাম, আমার স্ত্রী বোঝালো, কিন্তু কোন লাভ হলো না। আতাকে ধমক দিয়ে বললাম, আরে ভাই, বাড়াবাড়ি তো তুমি করছো। ওঁর কাছে ক্ষমা চাও, ব্যস চুকে যাবে।

আতা স্থির দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকিয়ে বলল, সাদাত, এ ঘটনার পরিসমাপ্তি এভাবে হবে না। এ মেয়েলোক আমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু আমি ওর সম্পর্কে একটি শব্দও এখনো মুখে আনি নি। এনায়েতকে চেনো তুমি?

—এনায়েত?

—হ্যাঁ, প্লে-ব্যাক সিঙ্গার। ওর বাবার শিষ্য।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—এক নম্বরের বদমাশ। কিন্তু এ মহিলা প্রতিদিন ওকে এখানে ডেকে আনে। বাহানা হলো এই যে—

তাহেরা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, বাহানা-টাহানা কিছু নয়। বল, তুমি কি বলতে চাও?

আতা অপরিসীম ঘৃণার সাথে বলল, না, না, কিছু নয়।

তাহেরা মাথার এক দিকে চুলের গোছা সরিয়ে বলল, এনায়েত আমাকে ভালবাসে, ব্যস।

আতা এনায়েতকে বড় রকমের এবং তাহেরাকে ছোট একটা গালি দিল।

আবার শোরগোল শুরু হলো। বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলী আবার ব্যবহার হতে লাগলো। আমার এবং আমার স্ত্রীর সালিসীতে কোন ফল হলো না। আমার মনে হচ্ছিলো ওরা স্বামী-স্ত্রী শুধু ঝগড়া করে তৃপ্তি পাচ্ছে না। তাদের ঝগড়া হঠাৎ করে খুব বেড়ে যাচ্ছিল, আবার আপনা-আপনি স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। সমাধান কিছু হচ্ছিল না।

আমি দীর্ঘ সময় ভাবলাম যে, আতা এবং তাহেরা আসলে কি চায়? কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পোঁছাতে পারলাম না। দু'ঘণ্টা সময় এক অশ্বস্তিকর পরিবেশে কাটালাম, অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে বললাম, ভাই যদি তোমরা একত্রে থাকতে না পারো তাহলে পৃথক হয়ে যাও।

তাহেরা নীরব রইল, আতা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, পৃথক হওয়া নয়, তালাক।

তাহেরা চীৎকার করে বলল, তালাক, তালাক, তালাক। তালাক দিচ্ছ না কেন? আমি কবে তোমার পায়ে পড়ে বলেছি যে, আমাকে তালাক দিও না?

আতা দৃঢ়তার সাথে বলল, দিয়ে দেব এবং খুব শিগ্‌গীর। তাহেরা মাথার একদিকে চুলের গোছা সরিয়ে বলল, আজই দিয়ে দাও।

আতা উঠে গিয়ে টেলিফোনের কাছে দাঁড়াল, বলল, আমি কাজীর সাথে কথা বলছি।

দেখলাম ব্যাপার গুরুতর রূপ নিচ্ছে। উঠে গিয়ে আতাকে বাধা

দিয়ে বললাম, বেকুবী করো না, শান্ত হয়ে বসো।

তাহেরা বলল, না ভাইজান, আপনি বাধা দেবেন না।

আমার স্ত্রী তাহেরাকে শাসন করে বললেন, বাজে বকো না বলছি।

তালাক ছাড়া এ গোলমাল মিটবে না।—তাহেরা পা নাড়াতে নাড়াতে বলল।

শুনেছ তুমি?—আতা আমাকে এ কথা বলে আবার টেলিফোনের দিকে অগ্রসর হতে চাইল। আমি মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

তাহেরা আমার স্ত্রীকে বলল, আমাকে তালাক দিয়ে সেই চুন্নী অভিনেত্রীকে বিয়ে করবে।

আর তুই?—আতা জিজ্ঞেস করল।

আমি?—তাহেরা কপালের ঘামে ভেজা চুল সরাতে সরাতে বলল, আমি তোমার সেই দ্বিতীয় ইউসুফ এনায়েত খানকে—।

আতা বলল, আর নয়, সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যথেষ্ট হয়েছে। তুমি একদিকে সরে যাও।—আতা ডাইরেক্টরী খুলে কাজীর নাম্বার খুঁজতে লাগল।

রিং করতে শুরু করলে তাকে বাধা দেয়া সমীচীন মনে করলাম না। দুবার রিং করেও সে নাম্বার মেলাতে পারল না, কেন জানি ভুল হয়ে গেল। আমি তাকে দৃঢ়ভাবে এ ইচ্ছে থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করলাম। আমার স্ত্রীও অনুরোধ করলেন। কিন্তু আতা কারো কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না।

তাহেরা বলল, তুমি কিছু বলো না সফিয়া, ওই লোকের বুকে অন্তর বলতে কিছু নেই, আছে শুধু পাথর। বিয়ের আগে ও আমাকে যে চিঠি লিখেছে, তোমাকে সে চিঠি দেখাব? আমি তখন ছিলাম তার অন্তরের শান্তি, চোখের আলো। আমার কণ্ঠনিঃসৃত এক একটি শব্দ তখন তার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে ছিল যথেষ্ট। আমার চেহারার প্রতি মাত্র একবার তাকিয়ে ও হাসিমুখে মরতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এখন আমার ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

আতা পুনরায় নাম্বার মেলাতে চেষ্টা করলো। তাহেরা আরো বলল, আমার বাবার গানের প্রতিও তার ভালবাসা ছিল। সে গর্ব

করতো যে, এতো বড় একজন শিল্পী আমাকে তাঁর জামাতার মর্যাদা দিচ্ছেন। বিয়ের জন্যে আমার বাবাকে রাজী করাতে আমার বাবার পা পর্যন্ত মালিশ করেছে। অথচ আজ সেসব কিছু মনে নেই।

আতা টেলিফোনে নাম্বার মেলাতেই থাকলো।

তাহেরা আমাকে বলল, ও আপনাকে ভাই বলে সম্মান করে। বলছিল যে, আপনি যা বলবেন ও তাই মেনে নেবে। অথচ দেখুন, কাজীকে টেলিফোন করছে—আমাকে তালাক দেবার জন্যে।

আমি টেলিফোন একপাশে সরিয়ে বললাম, রাখো তো আতা!

না।—বলে আতা নিজের দিকে টেলিফোন টেনে নিল।

তাহেরা বলল, যেতে দিন ভাইজান, ওর মনে আমার প্রতি তো নেই, টুটুর প্রতিও কোন ভালবাসা নেই।

আতা দ্রুত পেছন ফিরে বলল, টুটুর নাম নিও না বলছি।

—কেন তার নাম নেব না?

আতা রিসিভার রেখে দিয়ে বলল, সে আমার।

তাহেরা জেদের বশে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমিই যখন তোমার নই, তখন সে কি করে তোমার হতে পারে? তুমি ওর নামও নিতে পারো না।

আতা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে নেব।

তাহেরার চেহারা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, টুটুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে?

আতা দৃঢ়তার সাথে বলল, হ্যাঁ।

জালিম কোথাকার!—তাহেরা চীৎকার করে উঠলো। সংজ্ঞাহীন হয়ে সে পড়ে যাচ্ছিল, আমার স্ত্রী তাকে ধরে ফেললেন।

আতা অস্থির হয়ে উঠলো। চোখে-মুখে পানির ছিটা, পাখার বাতাস, ওষুধ ইত্যাদি সব কিছুর ব্যবস্থা করতে লাগলো। নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলল, চুল ছিঁড়ল।

তাহেরার জ্ঞান ফিরে এলে তার হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, প্রিয়তমা, টুটু তোমার—টুটু তোমার।

তাহেরা কেঁদে কেঁদে বলল, না, সে তোমার।

আতা তাহেরার অশ্রুসিক্ত চোখে চুমু খেয়ে বলল, আমি তোমার—তুমি আমার—টুটু তোমার এবং আমার—দুজনের।

আমি আমার স্ত্রীকে ইশারা করলাম। বাইরে বেরিয়ে এলে আমরা গিয়ে অপেক্ষমান ট্যাক্সীতে বসলাম। আমার স্ত্রী হাসছিলেন।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, এই টুটুটা কে?

আমার স্ত্রী খিল খিল করে হেসে বললেন, তাদের ছেলে।

তাদের ছেলে?

স্ত্রী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কবে জন্ম নিয়েছে?

—এখনো জন্মায়নি। চার মাস চলছে।

এ ঘটনার চার মাস পর আমি বারান্দায় চুপ করে বসে ছিলাম, ফোনের শব্দ শুনে বিরক্তির সাথে উঠছিলাম, পরক্ষণে শব্দ শোনা গেল না। কিছুক্ষণ পর আমার স্ত্রী কাছে এলে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

—ইয়াজদানী সাহেব।

—নতুন কোন ঝগড়া হয়েছে?

—না, তাহেরার মেয়ে হয়েছে। তাও মৃত।

আমার স্ত্রী অশ্রুরোধ করতে করতে ভেতরে চলে গেলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম, এখন যদি তাহেরা এবং আতার মধ্যে ঝগড়া হয় তাহলে তা কোন্ টুটু মেটাবে?

●

সাহায্যে

এটা বলো না যে, এক লাখ হিন্দু এবং এক লাখ মুসলমান মরেছে, বরং বলো যে দু'লাখ মানুষ মারা গেছে। দু'লাখ মানুষের মৃত্যু বড় কোন ট্রাজেডি নয়, ট্রাজেডি হলো এতেও কারো বোধোদয় হলো না। এক লাখ হিন্দু মেরে মুসলমানরা এটা মনে করে থাকবে যে, হিন্দু ধর্ম মরে গেছে, কিন্তু তারা জীবিত আছে এবং থাকবে। একইভাবে এক লাখ মুসলমান মেরে হিন্দুরা বগল বাজাতে লাগল যে, ইসলাম নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সবাই জানে যে, ইসলামের উপর একটা হাল্কা আঁচড়ও লাগেনি। যারা মনে করে যে, বন্দুক দিয়ে ধর্ম শিকার করা যায় তারা নির্বোধ। ধর্ম, দ্বীন, ঈমান, বিশ্বাস, আকীদা—যা কিছু আছে সবই আমাদের দেহের নয় আত্মার সাথে সম্পৃক্ত। ছোরা, চাকু, গুলী দিয়ে কিভাবে তাকে নিঃশেষ করা যেতে পারে ?

মমতাজ সেদিন খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, আমরা মাত্র তিনজন তাকে জাহাজে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে সে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছিল। পাকিস্তান—যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কারোই ধারণা পর্যন্ত ছিল না।

আমরা তিনজনই হিন্দু। পশ্চিম পাঞ্জাবে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের বহু জান-মালের ক্ষতি হয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই মমতাজ আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। যুগল লাহোর থেকে তার বাবা মারা যাওয়ার খবর শুনে খুবই দুঃখিত হয়েছিল। এই দুঃখবোধের প্রেক্ষিতে একদিন সে মমতাজকে বলল, আমি ভাবছি যদি আমাদের এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় তাহলে আমি কি করব।

মমতাজ তাকে জিজ্ঞেস করল, কি করবে ?

যুগল শান্তভাবে জবাব দিল, আমি ভাবছি, খুব সম্ভব তোমাকে

মেরে ফেলব।

এ কথা শুনে মমতাজ একেবারে নীরব হয়ে গেল। প্রায় আট-দিন পর্যন্ত সে নীরবতায় অটল থাকলো। আকস্মিকভাবে করাচী যাওয়ার সংবাদ দিতে এলে তার এ নীরবতা ভাঙলো। তার এ ইচ্ছা সম্পর্কে আমরা তিনজন কেউ কিছু বললাম না। যুগল ভাবছে খুব সম্ভব তোমাকে মেরে ফেলবে। এ কথা বলার কারণেই মমতাজ বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। সে ভাবছে, আমি ক্ষেপে গিয়ে তাকে মেরে ফেলতে পারি এ আশংকা তাকে পেয়ে বসেছে। সম্ভবত এ কারণেই আমাদের আওয়ারা বন্ধু মমতাজ অস্বাভাবিক রকম নীরব হয়ে গেছে। বিশেষত রওয়ানা হবার কয়েক ঘণ্টা আগে—সকালে উঠেই সে পান করতে শুরু করলো। জিনিসপত্র এমনভাবে সাজানো যেন সে কোথাও প্রমোদ বিহারে যাচ্ছে। নিজে কথা বলছিল, নিজেই হাসছিল। কেউ দেখলে মনে করতো যে সে বোম্বাই ছাড়তে পেরে প্রবল আনন্দ অনুভব করছে। কিন্তু আমরা তিনজন জানি যে সে শুধু নিজের উত্তেজনা প্রশমন এবং নিজেকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করছে।

ভাবলাম, রওয়ানা হবার সময়ে মমতাজের সাথে আলাপ করবো। যুগলকেও কথা শুরু করার ইঙ্গিত করলাম। কিন্তু মমতাজ আমাদেরকে কোন সুযোগই দিল না।

তিন-চার পেগ পান করে যুগল আরো বেশী নীরব হয়ে গেল এবং অন্য কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি ও ব্রজমোহন তার সাথে রইলাম। মমতাজকে কয়েকটি বিল আদায় করতে হবে। ডাক্তারদের ফি দিতে হবে। লন্ড্রী থেকে কাপড় তুলতে হবে। হাসিখুশীর সাথে এসব কাজ করার পর পার্ক হোটেলের সামনের একটা পান দোকান থেকে পান নিলে তার চোখে অশ্রু উছলে উঠলো। ব্রজমোহনের কাঁধে হাত রেখে সে স্থান থেকে চলে আসতে আসতে মমতাজ বলল, মনে আছে ব্রজ, আজ থেকে দশ বছর আগে আমার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। গোবিন্দ তখন আমাকে এক টাকা ধার দিয়েছিল। পথে মমতাজ আর কোন কথা বলল না। বাড়ীতে

পৌঁছেই কথার ঝুড়ি যেন খুলে দিল। এমন সব কথা যার মাথামুণ্ডু কিছু নেই। কিন্তু সেসব কথা এতো সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল যে আমি ও ব্রজমোহন সেসব কথায় অংশগ্রহণ করলাম। যাত্রার সময় ঘনিয়ে এলে যুগলও অংশগ্রহণ করলো। ট্যাক্সি ষ্টেশনের পথে রওয়ানা হলে আবার সবাই নীরব হয়ে গেল।

মমতাজের দৃষ্টি বোম্বের প্রশস্ত বাজারসমূহকে বিদায় জানাচ্ছে। ট্যাক্সি ষ্টেশনে পৌঁছে গেল। ভীষণ ভিড়। হাজার হাজার উদ্বাস্তু যাচ্ছে। তাদের মধ্যে ভালো অবস্থার লোক কম এবং দুরবস্থারই অধিক। এতো ভিড় দেখেও আমার মনে হচ্ছিল যে মমতাজ একাকী যাচ্ছে। সে আমাদের ছেড়ে এমন জায়গায় যাচ্ছে যে জায়গা সে এর আগে দেখেনি, চেনা পরিচিত হবার পরও যে জায়গা তার কাছে অপরিচিত থেকে যাবে। কিন্তু এটা ছিল আমার ব্যক্তিগত ধারণা। মমতাজ তখন কি ভাবছিল, সেটা আমি জানি না।

কেবিনে সব জিনিসপত্র চলে যাওয়ার পর মমতাজ আমাদের একপাশে ডেকে নিয়ে গেল। আকাশ ও সমুদ্র পরস্পর যেখানে একাকার হয়ে আছে সেদিকে তাকিয়ে থেকে যুগলের হাত নিজের হাতে নিয়ে মমতাজ বলল, এটা নিছক প্রতারণা। আকাশ ও সমুদ্রের পরস্পর সম্মিলন একি সম্ভব? অথচ না হলেও এ দৃশ্য কতো সুন্দর!

যুগল চুপ করে রইল। সম্ভবত তার মনে মগজে এ কথার ঢেউ শিহরণ তুলছিল যে, আমি ভাবছি, খুব সম্ভব তোমাকে মেরে ফেলব।

জাহাজের বার থেকে মমতাজ ব্রাণ্ডি আনালো, কারণ সকাল থেকে সে তাই পান করছিল। আমরা চারজন গ্লাস হাতে ডেকের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, উদ্বাস্তুরা জাহাজে আরোহণ করছে, শান্ত নিথর সমুদ্রের উপর পাখীরা উড়ে উড়ে ফিরছে।

হঠাৎ একচুমুকে সব পানীয় শেষ করে যুগল মমতাজকে বলল, আমাকে মাফ করে দিও মমতাজ, মনে হয় সেদিন আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মমতাজ যুগলকে জিজ্ঞেস করল, তুমি

যখন বলেছিলে যে, আমি ভাবছি খুব সম্ভব তোমাকে মেরে ফেলব, তখন কি সত্যি সত্যি তুমি তাই স্থির করেছিলে? শান্ত মনে এ সিদ্ধান্তে পোঁচেছিলে?

যুগল হাঁ সূচক ঘাড় নেড়ে মুখে বলল, কিন্তু আমি দুঃখিত।

মমতাজ দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল, আমাকে মেরে ফেললে তোমারই অধিক দুঃখ হতো, তুমিই অনুতপ্ত হতে। ভেবে দেখলে বুঝতে পারতে যে তুমি মমতাজকে—একজন মুসলমানকে—একজন বন্ধুকে নয়, বরং একজন মানুষকে মেরেছ। যদি সে জারজ হয়ে থাকে তাহলে তুমি তার জারজত্বকে নয় বরং তাকে মেরে ফেলেছ, যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে তবে তুমি তার মুসলমানত্বকে নয় তার অস্তিত্বকে নিঃশেষ করে দিয়েছ। তার লাশ যদি মুসলমানদের হাতে আসতো তাহলে একটি কবরের সংখ্যা বাড়তো কিন্তু পৃথিবীতে একজন মানুষ কম হয়ে যেতো।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মমতাজ আবার বলতে শুরু করল, আমার ধর্ম আমাকে হয়তো শহীদ বলতো। কিন্তু সম্ভব হলে কবর ফেঁড়ে চীৎকার করে আমি বলতাম, আমি শাহাদাতের এ মর্যাদা চাই না। যে বিষয়ে পরীক্ষাই দেইনি সে বিষয়ে আমি ডিগ্রী পেতে চাই না। তোমার চাচাকে লাহোরে একজন মুসলমান মেরে ফেলেছে, বোম্বেতে এ খবর শুনে তুমি আমাকে খুন করে ফেললে—বল তুমি আর আমি কোন তমঘা কোন খেতাব পাওয়ার যোগ্য? লাহোরে তোমার চাচার হন্তাও কোন পুরস্কারের যোগ্য? আমি তো বলবো, যে মরেছে এবং যে মেরেছে উভয়েই একটা নিষ্ফল নিরর্থক কাজ করেছে। কথায় কথায় মমতাজ খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়লো। কিন্তু এ উত্তেজনার মধ্যেও একটা সরলতার প্রকাশ ছিল। মমতাজ বলছিল, ধর্ম, দ্বীন, ঈমান, বিশ্বাস, আকীদা যা কিছু আছে সবই আমাদের দেহের নয় আত্মার সাথে সম্পৃক্ত। ছোরা, চাকু, গুলী দিয়ে কিভাবে তাকে নিঃশেষ করা যেতে পারে?—তার এ কথা আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করছিল। এজন্যে আমি তাকে বললাম, তুমি ঠিক কথাই বলছ।

এ কথা শুনে মমতাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, না ঠিক নয়।

আমি বলছি যে, আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা যেন ঠিক বোঝাতে পারিনি। ধর্ম বলতে আমি সে ধর্ম বোঝাতে চাইনি যাতে আমরা শতকরা নব্বইজন জড়িয়ে আছি। বরং আমি বলতে চাই সেটাই ধর্ম যা একজন মানুষকে অন্যজন থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। কিন্তু কি সেই বৈশিষ্ট্য? দুঃখ হলো, আমি সেটা তোমাকে হাতের তালুতে রেখে দেখাতে পারছি না। এ কথা বলতে বলতে তার চোখে চমক সৃষ্টি হলো এবং সে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো, কিন্তু ওর মধ্যে কি এমন বিশেষত্ব ছিল? কট্টর হিন্দু, পেশা খুবই নিম্নমানের, তা সত্বেও তার আত্মা ছিল কতো উজ্জল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার?

সে বলল, একজন ভাড়ুয়ার।

আমরা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, একজন ভাড়ুয়ার?

মমতাজ সমর্থন সুচক মাথা নেড়ে বলল, আমি ভেবে বিস্মিত হচ্ছি যে, সে কেমনতরো মানুষ। অধিক আশ্চর্যের ব্যাপার হলো জনগণের নিকট সে একজন ভাড়ুয়া অর্থাৎ মেয়েদের দালাল হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তার বিবেক বোধ খুবই স্বচ্ছ—জাগ্রত।

মমতাজ চুপ করে রইল, কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ পর সে বলতে শুরু করল, ওর পুরো নাম আমার জানা নেই, তবে নামের একটা অংশ ছিল 'সাহায়ে' এটুকু মনে আছে। বেনারসের অধিবাসী। খুবই পরিচ্ছন্নতা-প্রিয়। তার আবাসস্থলে জায়গা ছিল খুবই কম, তা সত্বেও পর্দার ব্যবস্থা করে ছোট ছোট কামরা তৈরী করে নিয়েছিল। চাদর, গেলাফ সব সময়ে পরিচ্ছন্ন থাকতো। চাকর থাকা সত্বেও সে নিজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি নজর রাখতো। কারো সাথে সে ধোকা প্রতারণা করতো না। রাত গভীর হয়ে গেলে আশেপাশের কোথাও থেকে পানি মিশ্রিত মদ খেয়ে সে বলতো, আরে সাহেব অযথা পয়সা নষ্ট করো না। কোন মেয়ে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে সে সেটা খোলাখুলি প্রকাশ করতো। সে আমাকে জানালো যে, তিন বছরে সে বিশ হাজার টাকা উপার্জন করেছে। প্রতি গাহাকের নিকট থেকে আড়াইভাগ কমিশন নিয়ে উক্ত টাকা সে এত-

দিনে জমিয়েছে। জানি না, বিশ হাজার কেন, আরো বেশী কেন নয়? সে আমাকে বলেছিল যে, ত্রিশ হাজার টাকা পূর্ণ করে বেনারসে ফিরে যাবে এবং একটা ফলের দোকান দেবে! আমি জানি না, সে ফলের দোকান দেয়ার ইচ্ছে কেন করলো।

এতটুকু শুনে আমি বললাম, অদ্ভুত মানুষ!

মমতাজ কথা অব্যাহত রাখলো, আমি ভেবেছিলাম তার সব কিছু প্রতারণা, সে একটা জালিয়াত, তার ধান্দায় জড়িত প্রতিটি মেয়েকে সে আপন কন্যার মতো মনে করতো—এটা কে বিশ্বাস করতে পারবে? আমি তখন এটাও ভাবতে পারিনি যে, সে প্রতিটি মেয়ের নামে পোষ্ট অফিসে সেভিংস একাউণ্ট খুলে রেখেছে এবং প্রতি নামে প্রত্যেকের উপার্জন পৃথকভাবে তাদের নামে জমা রাখছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য ছিল যে, সে তাদের ভরণ পোষণের ব্যয়ভার নিজেই বহন করতো। তার প্রতিটি ব্যাপার সাধারণের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি মনে হতো। একদিন আমি ওর কাছে যাওয়ার পর সে বললো, আমিনা ও সকিনা ছুটিতে গেছে, প্রতি সপ্তাহে আমি ওদেরকে বাইরের হোটেলে মাছ ও অন্য কিছু খেয়ে আসার জন্যে ছুটি দিয়ে দেই। আপনি তো জানেন, এখানে সবাই নিরামিষভোজী।

এসব শুনে আমি মনে মনে হাসলাম।

একবার সে আমাকে জানালো, আহ্‌মদাবাদেরযে হিন্দু মেয়েটির একজন গাহাকের সাথে বিয়ে হয়েছে সে লাহোর থেকে এক চিঠিতে জানিয়েছে যে, দাতা সাহেব-এর রওজায় সে একটা মানত চেয়েছে এবং তা পূর্ণ হয়েছে। এবার সে সাহায়ে-এর তাড়াতাড়ি ত্রিশ হাজার টাকা পুরো হওয়ার মানত করেছে, যেন সে বেনারস গিয়ে ফলের দোকান খুলতে পারে।

এ কথা শুনে আমি হাসলাম, ভাবলাম আমি যেহেতু মুসলমান এ জন্যে আমাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করছে।

আমি মমতাজকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ধারণা কি ভ্রান্ত ছিল?

না তার কথা ও কাজের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম ছিল না। তার মধ্যে হয়তো কোন ত্রুটি থাকতে পারে, খুব সম্ভব জীবনে সে কয়েকবার

ভুলও করেছে কিন্তু সে ছিল একজন খুবই ভাল মানুষ।

যুগল জিজ্ঞেস করলো, এটা তুমি কি করে বুঝলে?

তার মৃত্যুর ঘটনায়।—এই বলে মমতাজ কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর আকাশ সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়ার দৃশ্যের প্রতি তাকিয়ে মমতাজ বলল, দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। খুব ভোরে উঠে ভেণ্ডি বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। কারফিউর কারণে রাস্তায় লোক চলাচল ছিল খুবই কম। ট্রামও চলছিল না, ট্যাক্সির খোঁজে যেয়ে হাসপাতালের নিকট পৌঁছে দেখলাম, ফুটপাতের উপর একটা গাঁটরির মতো পড়ে আছে, ভাবলাম কোন শ্রমিক শুয়ে আছে। কিন্তু পাথরের টুকরোর উপর রক্তের দাগ দেখে চমকে উঠলাম। হত্যার ঘটনা, ভাবলাম তাড়াতাড়ি নিজের কাজে যাই। কিন্তু লাশ নড়াচড়া করে আবার অনড় হয়ে গেল। আশেপাশে কেউ ছিল না, আমি একটু ঝুঁকে তার প্রতি তাকালাম। দেখি সাহায়ে-এর চেনা মুখ রক্তে ভরে আছে। ফুটপাতে তার পাশে বসে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখি, সব সময়ে স্বচ্ছ থাকা তার সাদা জামা রক্তে ভিজে গেছে। জখম ছিল পিস্তলের। সে কাতরাতে শুরু করলো। আমি তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিলাম, দু'একবার অসম্পূর্ণ নামে ডাকলাম। উঠে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে সে চোখ মেলে তাকালো এবং দীর্ঘক্ষণ অপলক চোখে আমার প্রতি তাকিয়ে রইল। তারপর তার সারা দেহে কম্পন সৃষ্টি হলো। সে আমাকে চিনতে পেরে বলল, আপনি?

কিভাবে এলো, কিভাবে জখম হলো, কখন থেকে ফুটপাতে পড়ে আছে—এসব কথা ওকে জিজ্ঞেস করলাম। সামনে হাসপাতাল। ওখানে খবর দেব কিনা জিজ্ঞেস করলাম।

তার মধ্যে কথা বলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার সব প্রশ্নের জবাবে সে শুধু বলল, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এটাই ভগবানের ইচ্ছে ছিল।

ভগবানের ইচ্ছের কথা আমার জানা ছিল না তবে আমি এটা দেখতে চাইনি যে, মুসলমান হয়ে মুসলমান এলাকায় এমন একটা লোককে মরতে দেখব, যে কিনা হিন্দু অথচ তার আততায়ী মুসল-

মান। তার শিয়রে মৃত্যুকালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিও মুসলমান। আমি ভীরু পুরুষ ছিলাম না বটে কিন্তু তখন আমার অবস্থা ছিল কাপুরুষের চেয়েও নিকৃষ্ট। একদিকে গ্রেফতার হওয়ার আশংকা অন্যদিকে গ্রেফতার না হলেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ধরে নিয়ে যাওয়ার আশংকা। ভাবলাম, যদি ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দেই তবে হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে। ভাববে, আমি তো মরছিই, ওকে সাথে নিয়েই মরি।—এসব কথা ভাবছিলাম। সত্যি বলতে কি পালাতে চাচ্ছিলাম, এমন সময় সাহায়ের ডাকে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার পা আটকে গেল, তার দিকে এমনভাবে তাকালাম যেন তাকে বলছি, তাড়াতাড়ি করো, আমাকে যেতে হবে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে সে অনেক কষ্টে জামার বোতাম খুললো এবং ভেতরে হাত প্রবেশ করিয়ে আর কিছু করতে না পেরে বলল, ওখানে একটা প্যাকেটে কিছু অলংকার ও বারোশত টাকা আছে—সুলতানার জিনিস। আমি—আমি এক বন্ধুর কাছে রেখেছিলাম। আজ—আজ ওকে পাঠানোর কথা ছিল। কারণ—আপনি জানেন গোলমাল বেড়ে গেছে। আপনি ওকে দিয়ে দেবেন।—বলবেন তাড়াতাড়ি যেন চলে যায়—কিন্তু নিজের প্রতি যেন খেয়াল রাখে।

মমতাজ নীরব হয়ে গেল। আমি অনুভব করলাম যে, ওর কণ্ঠস্বর জে. জে. হাসপাতালের সামনের ফুটপাত থেকে আকাশ ও সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া সাহায়ের কণ্ঠস্বরের সাথে মিলে গেছে।

জাহাজে হুইসেল পড়লে মমতাজ বলল, সুলতানার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে অলংকার ও টাকা দিলে তার চোখে অশ্রু উছলে উঠলো।

বিদায় নিয়ে আসার পর দেখি, মমতাজ ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ডান হাত দোলাচ্ছে। যুগলকে বললাম, তোমার কি মনে হয় না যে, সাহায়ের সঙ্গী হওয়ার জন্যে মমতাজ যেন সাহায়ের আত্মাকে ডাকছে।

যুগল শুধু বলল, ইস, যদি আমি সাহায়ের আত্মা হতাম!

রাম খেলাওন

ছারপোকা মেরে ট্রাঙ্কের পুরনো কাগজপত্র দেখতে দেখতে সাঈদ ভাইজানের ছবি পেয়ে গেলাম। টেবিলের উপর পড়ে থাকা একটা খালি খামে ছবিটা রেখে চেয়ারে বসে ধোপার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রত্যেক রবিবারেই আমাকে এভাবে অপেক্ষা করতে হয়। কারণ সপ্তাহের শেষ দিন বিকেলে আমার ইস্ত্রিকরা কাপড়ের ষ্টক ফুরিয়ে যায়। ষ্টক বলা উচিত নয়, দিনকাল যা পড়েছে এ সময়ে মার্জিতভাবে সপ্তাহ কাটিয়ে দেয়ার মতো পরিমিত ছাড়া অতিরিক্ত কাপড় আমার নেই।

আমার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল, এজন্যে গত দু'তিন রবিবার থেকে আমি ভাবী শ্বশুরালয়ে যাচ্ছিলাম। ধোপা ছিল বেশ ভদ্র, নিয়মিত প্রতি রবিবার সকাল দশটায় আমার কাপড় নিয়ে আসতো, তবু আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, আমার সরলতার সুযোগে কবে না জানি কাপড়গুলো বাজারে বিক্রি করে দেয় আর আমাকে বিয়ের কথাবার্তায় পোষাকবিহীন অবস্থায় অংশগ্রহণ করতে হয়। যা কিনা খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার।

কামরায় মৃত ছারপোকার দুর্গন্ধ অসহ্য লাগছে। এ গন্ধের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় ভাবছিলাম, এমন সময় 'সার সালাম' বলে ধোপা এসে হাজির। গাঁটরি খুলে আমার কাপড়গুলো বের করে সে টেবিলের উপর রাখলো। কাপড় রাখতে গিয়ে সাঈদ ভাইজানের ফটোর প্রতি তার দৃষ্টি পড়লো। অকস্মাৎ চমকে উঠে গভীর দৃষ্টিতে ফটোর প্রতি তাকিয়ে ধোপা বিস্ময়কর ভাবে বলল, হায় হায় হায়!

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ধোপা?

ফটোর প্রতি একই ভাবে তাকিয়ে থেকে সে বলল, ইনি তো

সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টার।

কে?

ধোপা আমার প্রতি তাকিয়ে দৃঢ়তার সাথে বললো, সায়ীদ সা-লীম বালেষ্টার।

—তুমি ওঁকে জান?

ধোপা জোরে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, ওরা দু'ভাই ছিলেন। এদিকে কোলাবাতে তাঁদের বাসা ছিল। সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টার—আমি ওঁর কাপড় ধোলাই করতাম।

আমি ভাবলাম, সম্ভবত এটা দু'বছর আগের কথা। সাঈদ হাসান ও মোহাম্মদ হাসান ভাইজান তখন ফিজি দ্বীপে যাওয়ার আগে প্রায় এক বছর বোম্বেতে প্রাকটিস করেছিলেন। এজন্যে আমি তাকে বললাম, তুমি দু'বছর আগের কথা বলছ?

ধোপা জোরে মাথা নাড়াল। বলল, হাঁ, সা-য়ীদ সা-সালীম বালেষ্টার যাওয়ার সময় আমাকে একটা পাগড়ি দিয়ে দিয়েছিলেন, একটা ধুতি দিয়েছিলেন, একটা কোর্তা দিয়েছিলেন—নতুন। খুব ভাল লোক ছিলেন তাঁরা। একজনের দাঁড়ি ছিল ইয়া লম্বা। হাত দিয়ে সে দাড়ি কতটুকু লম্বা ছিল তা দেখালো। সাঈদ ভাইয়ের কথা ইঙ্গিত করে বলল, ইনি ছোট ছিলেন। তার তিনটা ছেলেমেয়ে ছিল, দুটি ছেলে একটি মেয়ে। আমার সঙ্গে খুব খেলা করতো। কোলাবাতে একটা বাসায় থাকতো। খুব বড় ছিল সে বাসা।

আমি বললাম, আরে ওঁরা তো আমার ভাই।

ধোপা অদ্ভুত ধরনের কণ্ঠস্বরে বলল, হায় হায় হায়—সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টার!

আমি তার বিস্ময়ের ঘোর কাটানোর চেষ্টা করে বললাম, এ ছবি সাঈদ ভাইজানের, যার দাড়ি রয়েছে তার নাম মোহাম্মদ হাসান, আমাদের সবার তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ।

ধোপা আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর কামরার অপরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ করলো। বৈদ্যুতিক আলোবিহীন একটা ছোট কামরা। একটা চেয়ার, একটা টেবিল আর একটা চটের কোট যার

গায়ে সংখ্যাতীত ছারপোকা জড়িয়ে আছে। আমি যে সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টারের ভাই এটা ধোপার বিশ্বাস হলো না। কিন্তু তাকে ভাইয়ের অনেক কথা শোনানোর পর সে বিস্ময়করভাবে মাথা নেড়ে বলল, সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টার কোলাবাতে থাকতেন আর তুমি এই কুঠুরীতে!—আমি বিজ্ঞজনোচিত ভাবে মাথা নেড়ে বললাম, এটাই পৃথিবীর রঙ, ধোপা। কোথাও রোদ কোথাও ছায়া। পাঁচটা আঙুল এক রকমের হয় না।

ধোপা গাঁটরি তুলে বাইরে যেতে যেতে বলল, হ্যাঁ সাব, তুমি ঠিকই বলেছ।—তার টাকা পাওনার হিসেবের কথা আমার মনে পড়লো। অথচ পকেটে পয়সা আছে মাত্র আট আনা যাতে কিনা বিয়ের কথাবার্তা বলতে যাওয়ার পথভাড়া কোন রকমে হতে পারে।

আমার মন পরিষ্কার শুধু এ কথাটা জানানোর জন্যে তাকে ডেকে বললাম, ধোপা, কাপড়ের হিসেব রেখো, জানি না কতগুলো ধোলাই করেছো।

ধোপা ধুতির আঁচল সামলাতে সামলাতে বলল, সাব আমি তো হিসেব রাখি না। এক বছর সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টারের কাজ করেছি, যা দিয়েছেন তাই নিয়েছি। আমি হিসেব জানি না।

এই বলে সে চলে গেল। আমি বিয়ের কথাবার্তার ব্যাপারে শ্বশুরালয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আলোচনা সফল হলেও, যথাসময়ে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। অবস্থার উন্নতি হলো, আমি সেকেণ্ড পীর খান লেনের নয় টাকা ঘর ভাড়া থেকে কালেক্টর রোডে পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়ায় বাসা নিলাম। এ সময়ে ধোপাকে মাসে মাসে নিয়মিত তার পাওনা মিটিয়ে দিতাম।

আমার অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে দেখে ধোপা খুশী হলো। একদিন আমার স্ত্রীকে সে বলল, বেগম সাব, সাব-এর ভাই সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টার অনেক বড় মানুষ ছিলেন, এদিকে কোলাবায় থাকতেন। যাওয়ার সময়ে আমাকে একটা পাগড়ি, একটা ধুতি, একটা জামা দিয়েছেন। তোমার সাবও একদিন বড় মানুষ হবে।

ছবি সংক্রান্ত কাহিনী স্ত্রীকে আমি আগেই শুনিয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম যে, আমার দুর্দিনে ধোপা উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে আমার সহায়তা করেছিল। যখন যা দিয়েছি তাই নিয়েছে, কখনো অভিযোগ বা আপত্তি করেনি। কিন্তু কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরই ধোপার বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ দেখা দিল। স্ত্রী বলল যে, ধোপা হিসেব করে না। আমি বললাম, চার বছর থেকে কাজ করছে কিন্তু কখনো সে হিসেব করেনি।

স্ত্রী জবাব দিল, দু'তিন গুণ বেশী উশুল করতে পারলে আর হিসেব করবে কেন?

—সে কেমন?

—আপনি জানেন না। যাদের ঘরে বউ থাকে না, এ ধরনের লোক তাদের বেকুব বানিয়ে ছাড়ে।

হিসেব না রাখার কারণে ধোপার সাথে আমার স্ত্রী প্রতিমাসে কথা কাটাকাটি করতো। ধোপা বলতো, বেগম সাব, আমি হিসেব জানি না। তুমি মিথ্যা বলবে না, সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টার সাবের ভাই ছিলেন। আমি এক বছর তার কাজ করেছি। বেগম সাব বলতেন, ধোপা, তোমার এতো পয়সা হয়েছে। আমি বলতাম, ঠিক আছে।

একমাসে আড়াইশ কাপড় ধোলাই করা হয়। আমার স্ত্রী ধোপাকে পরীক্ষা করার জন্যে বলল, এ মাসে আটটা কাপড় ধোলাই হয়েছে। ধোপা বলল, ঠিক আছে বেগম সাব, তুমি মিথ্যা বলবে না।

তারপর আমার স্ত্রী আটটা কাপড়ের হিসেব অনুযায়ী তাকে টাকা দিলে সে মাথার সাথে টাকা ছুঁইয়ে সালাম জানিয়ে চলে গেল। আমার স্ত্রী তাকে পেছন থেকে ডেকে বলল, দাঁড়াও ধোপা, আটটা নয় আড়াইশো কাপড় হয়েছে। এই নাও বাকি টাকা। আমি রসিকতা করেছিলাম।

ধোপা শুধু বলল, বেগম সাব, তুমি মিথ্যা বলবে না।—এই বলে মাথার সাথে টাকা ছুঁইয়ে সালাম জানিয়ে চলে গেল।

বিয়ের দু'বছর পর আমি দিল্লী চলে গেলাম। দেড় বছর সেখানে

থাকলাম। তারপর বোম্বে ফিরে এসে শ্বশুরালয়ে থাকতে লাগলাম। তিন মাসে আমরা চারজন ধোপা বদল করলাম। কারণ ওরা সবাই ছিল বেঈমান ও ঝগড়াটে। প্রত্যেকবার কাপড় ধোলাই করলে ঝগড়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। কখনো হিসেবে কাপড় কম, কখনো ধোলাই বাজে। এ সময়ে প্রায়ই পুরনো ধোপার কথা আমাদের মনে পড়তো। একদিন হঠাৎ সে হাজির। ঘটনাক্রমে তখন আমাদের কোন ধোপা ছিল না। এসেই বলল, একদিন সাবকে আমি বাসে দেখেছি। ভাবলাম, এটা কি করে সম্ভব, সাব তো দিল্লী চলে গেছেন। এদিকে সেদিকে বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ করেছি। অবশেষে বাজুয়ালীতে সাবের এক বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে এখানে এসেছি।

আমরা খুব খুশী হলাম। আমাদের কাপড়েরও সুদিন ফিরে এলো। কংগ্রেস পার্টি ক্ষমতায় এলে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। বিলেতী মদ পাওয়া যেতো বটে কিন্তু দেশী মদ বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। ধোপাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ছিল মদে অভ্যস্ত। সারাদিন পানিতে থাকার পর সন্ধ্যায় এক পোয়া বা আধপোয়া মদ তাদের জীবনের অংশে পরিণত হয়েছিল। আমাদের ধোপা অসুস্থ হবার পর সে গোপনীয় ভাবে বিক্রি করা চোরাই মদ দিয়ে নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো। ফলে তার অন্ত্রনালীতে মারাত্মক গোলযোগ দেখা দিল এবং সে মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলো।

আমি খুবই ব্যস্ত থাকতাম। ভোর ছ'টায় ঘর থেকে বেরিয়ে রাত দশটা সাড়ে দশটায় ফিরতাম। ধোপার মারাত্মক অসুখের কথা শুনে আমার স্ত্রী ট্যাক্সী নিয়ে তার বাড়ী গেল। চাকর ও অন্য একটা লোকের সাহায্যে তাকে গাড়ীতে তুলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার খুবই প্রভাবিত হলেন এবং ফি নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমার স্ত্রী বলল, ডাক্তার সাহেব, আপনি সব পুণ্য নিতে পারেন না।

ডাক্তার হেসে বললেন, তবে আধাআধি করুন। তারপর অর্ধেক ফি গ্রহণ করলেন।

নিয়মিত ধোপার চিকিৎসা হলো। কয়েকটা ইঞ্জেকশনেই অন্ত্র-

নালির গোলযোগ কেটে গেল। শারীরিক দুর্বলতা শক্তিপ্রদ ওষুধে কেটে গেল। কয়েক মাসে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে সে উঠতে বসতে লাগলো। আমাদের জন্যে দোয়া করতে শুরু করলো। বলতো, ভগবান, সাবকে সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টার করে দিন। এদেরকে কোলাবায় থাকার সামর্থ্য দিন। অনেক ছেলেমেয়ে, অনেক অনেক টাকা হোক। বেগম সাব ধোপাকে মোটরে চড়িয়ে অনেক বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তাই ধোপা প্রার্থনা জানালো, ভগবান, বেগম সাবকে সুখে রাখুন।

কয়েক বছর কেটে গেল। এ সময়ে কয়েকবার রাজনৈতিক বিপ্লব এলো। ধোপা প্রতি রবিবারে যথারীতি আসতো। তার স্বাস্থ্যেরও বেশ উন্নতি হয়েছিল। এতো বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও সে আমাদের ব্যবহার ভুলতে পারেনি। সব সময় আমাদের জন্যে দোয়া করতো। মদ একেবারেই সে ছেড়ে দিয়েছিল। প্রথম দিকে মদের কথা বলতো, কিন্তু ধীরে ধীরে ভুলে গেছে। সারাদিন পানিতে কাটালে ক্লান্তি দূরীকরণের জন্যে তার এখন আর মদের প্রয়োজন হতো না।

পরিস্থিতির খুবই অবনতি ঘটলো। দেশ-বিভক্তির পর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলো। মুসলিম এলাকায় হিন্দু এবং হিন্দু এলাকায় মুসলিম—আলো এবং অন্ধকারে একে অন্যকে হত্যা করতে লাগলো। আমার স্ত্রী লাহোর চলে গেলো।

পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলে আমি একদিন ধোপাকে বললাম, দেখো, এবার কাজ ছেড়ে দাও। এটা মুসলমান পাড়া। তোমাকে কে কবে মেরে ফেলে!

ধোপা হেসে বলল, সাব, আমাকে কেউ মারতে পারবে না।

আমাদের এলাকায় কয়েকটা ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও ধোপা নিয়মিত আসতে লাগলো। এক রবিবারে আমি ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। ক্রীড়াপাতায় ক্রিকেট ম্যাচ-এর স্কোর দেখছিলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় দাঙ্গায় নিহত হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা উল্লিখিত ছিল। এ দুটি ভয়াবহ চিত্র নিয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় ধোপা

এসে হাজির হলো। গাঁটরি খুলে কাপড় গুণে দেখছিলাম। ধোপা হেসে হেসে কথা বলছিল। বলছিল, সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টর ছিল খুবই ভালো মানুষ। এখান থেকে যাওয়ার পথে আমাকে একটা পাগড়ি, একটা ধুতি, একটা কোর্তা দিয়ে গেছেন। তোমার বেগম সাহেবও একজন ভাল মানুষ। বাইরে কাজে গেছে না? নিজের দেশে? ওদিকে কাগজ লিখলে আমার সালাম বলবে। মোটর নিয়ে আমার বাড়ীতে গিয়েছিল—আমার এতো জোলাব এসেছিল—ডাক্তার সুঁই লাগালো, একেবারে ভাল হয়ে গেলাম। ওদিকে কাগজ লিখলে আমার সালাম বলবে। বলবে যে, রাম খেলাওন তাকেও কাগজ লিখতে বলেছে।

আমি তার কথার মধ্যেই বললাম, ধোপা, তুমি দারু শুরু করেছ?

ধোপা হেসে বললো, দারু? দারু কোথায় পাব সাব?

আমি আর কিছু বলা সমীচীন মনে করলাম না। ময়লা কাপরের গাঁটরি বেঁধে সালাম জানিয়ে সে চলে গেল।

কয়েকদিনের মধ্যে অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। লাহোর থেকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসতে লাগলো যে সবকিছু ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো। আমি ঠিক করলাম যে রবিবারে চলে যাব। কিন্তু প্রত্যুষে বাইরে যেতে হতো। কাপড় ধোপার কাছে রয়েছে। ভাবলাম কারফিউ হওয়ার আগে তার বাড়ী গিয়ে নিয়ে আসব। এজন্যে শনিবার বিকেলে ভিক্টোরিয়া নিয়ে মহালক্ষী রওয়ানা হলাম।

কারফিউ শুরু হতে আরো এক ঘণ্টা বাকি। এজন্যে পথচারীদের যাতায়াত রয়েছে। ট্রাক চলাচল করছে। সেতুর কাছে ভিক্টোরিয়া পৌঁছলে দেখলাম প্রচণ্ড গোলমাল। যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন ষাড়ের লড়াই। পথচারীদের ভিড় কিছুটা কমলে দেখা গেল ভাটির নিকটে বহু সংখ্যক ধোপা লাঠি নিয়ে লাঠালাঠি করছে। তাদের মুখে রকমারী শব্দাবলী উচ্চারিত হচ্ছে। আমাকে ভাটির দিকেই যেতে হবে। কিন্তু ভিক্টোরিয়াওয়ালা

সেদিকে যেতে অস্বীকৃতি জানালো। তার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। ধোপাদের কাছে পৌঁছলে আমাকে দেখে তারা থেমে গেল। আমি একজন ধোপাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাম খেলাওন কোথায় থাকে?

লাঠি হাতে একটা ধোপা টলতে টলতে এগিয়ে এসে আমি যাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে বললো, কি জিজ্ঞেস করছে?

সে জবাব দিল, জিজ্ঞেস করছে, রাম খেলাওন কোথায় থাকে?

মদে চুর ধোপা আমার উপর চড়াও হবার উপক্রম করে বললো, তুমি কে?

—আমি? রাম খেলাওন আমার ধোপা।

—রাম খেলাওন তোমার ধোপা! তুমি কোন ধোপার বাচ্চা?

একজন ধোপা চীৎকার করে বললো, মুসলমান ধোপার নাকি হিন্দু ধোপার?

মদের নেশায় টলোমলো ধোপার দল কেউবা ছুরি কেউবা লাঠি ঘুরিয়ে আমাকে ঘিরে ধরলো। তাদেরকে একটা প্রশ্নেরই জবাব দিতে হবে যে আমি হিন্দু নাকি মুসলমান। আমি ভীষণ ভয় পেলাম। পালানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ওরা আমাকে ঘিরে ধরেছে। আশে-পাশে কোন পুলিশও দেখছি না যে সাহায্যের জন্যে ডাকবো। কি যে করবো কিছুই বুঝতে না পেরে কায়দা করে তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। বললাম, রাম খেলাওন হলো হিন্দু। আমি জিজ্ঞেস করছি, সে কোথায় থাকে? তার ঘর কোনটা? দশ বছর থেকে সে আমার ধোপা ছিল, খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—আমরা তার চিকিৎসা করিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী—আমার মেম সাহেব এখানে মোটর নিয়ে এসেছিল ·····এ পর্যন্ত বলার পর নিজের উপর আমি করুণাবোধ করলাম। মনে মনে এই ভেবে ক্রুদ্ধ হলাম যে, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মানুষ কতো নীচে নামতে পারে। এ অনুভূতি মনে জাগ্রত হলে সাহস ফিরে পেলাম। দৃঢ়স্বরে বললাম, আমি মুসলমান।

—মেরে ফেলো, মেরে ফেলো! সবাই চীৎকার করে উঠলো।

প্রথমে আমার উপর চড়াও হতে যাওয়া মদে চুর হওয়া লোকটা

ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, থামো, ওকে রাম খেলাওন মারবে।

আমি অন্যদিকে তাকিয়ে দেখলাম রাম খেলাওন একটা মোটা লাঠি হাতে এলোমেলো পায়ে এগিয়ে আসছে। মুসলমানদের কে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করছে? গালি দিতে দিতে মাথার উপরে লাঠি উঠিয়ে রাম খেলাওন এগিয়ে এলো। কাছাকাছি হতেই বুদ্ধি করে আমি চীৎকার করে ধমকের স্বরে বললাম, রাম খেলাওন?

সে এতটুকু ভীত না হয়ে পাল্টা আমাকে বললো, চুপ কর বে রাম খেলাওনের……

শেষ আশার প্রদীপও নিভে গেল। শুকনো গলায় বললাম, আমায় চিনতে পারোনি রাম খেলাওন?

মুহূর্তে যেন তার সম্বিৎ ফিরে এলো। চোখ বড় বড় করে সে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। লাঠি হাত থেকে পড়ে গেল। কাছে এসে বললো, সাব? তারপর সাথীদের বললো, উনি মুসলমান নন, উনি আমার সাব—সাবের সাব—তিনি মোটর নিয়ে এসেছিলেন—ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন—ডাক্তার আমার জোলাব ঠিক করেছিলো।

রাম খেলাওন সঙ্গীদের অনেক করে বোঝালো, কিন্তু কেউ মানলো না। সবাই ছিল মদের নেশায় চুর। বাকবিতণ্ডা শুরু হলো, কিছু সংখ্যক ধোপা রাম খেলাওনের পক্ষ নিলে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে আমি কেটে পড়লাম।

পরদিন সকাল নটায় আমার জিনিসপত্র সব তৈরী করে প্লেনের টিকেটের প্রতীক্ষা করছি। কালোবাজারে টিকেট ক্রয়ের জন্যে এক বন্ধু গিয়েছিল। খুবই অস্থিরতার মধ্যে কাটাচ্ছিলাম। নানা কথা মনে আসছিল। ভাবছিলাম কখন টিকেট আসবে কখন গিয়ে বিমানে উঠতে পারবো, দেরী হলে কি যে হবে।

হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনে ভাবলাম, টিকেট এসে গেছে। দরজা খুলে দেখি ধোপা দাঁড়িয়ে। বললো, সাব সালাম।

আমি জবাব দিলাম।

বললো, ভেতরে আসব?

বললাম, এসো।

রাম খেলাওন ভেতরে এসে গাঁটরি খুলে কাপড় বের করে খাটের উপর রেখে ধুতিতে চোখ মুছে বললো, তুমি যাচ্ছ সাব?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

রাম খেলাওন কাঁদতে শুরু করলো। বললো, আমাকে ক্ষমা করে দাও। সবকিছু দারুর কারণে হয়েছিল। আজকাল দারু মুফ্‌ত পাওয়া যাচ্ছে। শেঠেরা দারু বণ্টন করে। বলে যে, দারু খেয়ে মুসলমানদের মারো। মুফত পাওয়া দারু কে ছাড়ে বল? আমাকে মাফ করে দাও সাব—সা-য়ীদ সা-লীম বালেষ্টার খুব দয়ালু ছিলেন—আমাকে একটা পাগড়ি, একটা ধুতি, একটা কোর্তা দিয়েছিলেন। তোমার বেগম সাব আমার জান বাঁচিয়েছেন। জোলাবের তোড়ে আমি মরে যেতাম। সে মোটর নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল—এতো টাকা খরচ করেছিল। তুমি দেশে গিয়ে তার কাছে বলো না যে রাম খেলাওন··· তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। গাঁটরির চাদর কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যেতে শুরু করলো। আমি ডেকে বললাম, দাঁড়াও, রাম খেলাওন। কিন্তু সে তাকালো না। ধুতির আঁচল সামলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

●

বিসমিল্লাহ

চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে জহিরের সাথে সাঈদের সাক্ষাৎ হলে সাঈদ খুবই প্রভাবিত হলো। বোম্বেতে সেণ্ট্রাল ষ্টুডিওতে জহিরকে দু' একবার সে দেখেছে, কিছু আলাপও হয়েছে, কিন্তু লাহোরেই প্রথম বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা এবং দীর্ঘ সময় ধরে সাক্ষাৎ হয়।

লাহোরে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক, কিন্তু সাঈদ এ তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল যে তাদের অধিকাংশের অস্তিত্বই শুধু সাইন-বোর্ড পর্যন্ত সীমিত। আকরামের মাধ্যমে জহিরের সাঈদকে ডেকে পাঠানোর পর সাঈদ ভেবেছিল, জহিরও ওসব সাইনবোর্ড সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীদের মতোই একজন ভূয়া চিত্র-নির্মাতা, যারা লক্ষ লক্ষ টাকার কথা বলে, অফিস স্থাপন করে, ভাড়া করা ফার্নিচার এনে ঘর সাজায়, তারপর একদিন আশেপাশের হোটেলে টাকা বাকি রেখে কেটে পড়ে।

জহির সাঈদকে সরলভাবে জানালো যে, সে অল্প পুঁজিতে ছবি করতে চায়। বোম্বেতে সে একটা ষ্ট্যাণ্ট চিত্র-নির্মাতার সহকারী হিসাবে পাঁচ বছর কাজ করেছিল। নিজে ছবি করার মতো সুযোগ পেয়ে পেয়ে যাচ্ছিল, এ সময়ে ভারত বিভক্ত হয়ে গেলো এবং তাকে পাকিস্তানে চলে আসতে হলো, পাকিস্তানে এসে প্রায় আড়াই বছর পর্যন্ত বেকার অবস্থায় কাটালো, তবে টাকা লগ্নিতে প্রস্তুত কয়েকজন লোক ঠিক করলো। সাঈদকে বললো, দেখুন, আমি কোন প্রথম শ্রেণীর ছবি তৈরী করতে চাই না, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, একটা ষ্ট্যাণ্ট ছবি তৈরী করতে চাই, যাতে করে পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে সমান অংক মুনাফা হতে পারে। আপনার মতামত কি?

সাঈদ কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিল, হ্যাঁ, তাতো মুনাফা হওয়া উচিত।

জহির বললো, যারা টাকা খাটাতে প্রস্তুত তাদের আমি বলে দিয়েছি যে, আমি হিসেব-নিকেশের কিছু জানি না। এটা আপনাদের

কাজ, বাকি সবকিছু আমি দেখাশোনা করব।

সাঈদ জিজ্ঞেস করলো, আমি আপনার কি কাজে আসতে পারি?

জহির সরলভাবে বললো, পাকিস্তানের প্রায় চিত্র প্রযোজক আপনাকে চেনে। এখানে তাদের কাউকে আমি চিনি না। আপনি যদি আমার চিত্র প্রযোজনার দায়িত্বটা গ্রহণ করেন, খুবই কৃতার্থ হব।

সাঈদ বললো, আপনি ছবি তৈরী করুন। ইনশাল্লাহ ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

টেবিলের উপর পড়ে থাকা প্যাডে ফুল এঁকে জহির বললো, আপনার বড়ই মেহেরবানী হবে সাঈদ সাহেব। আমার শতকরা একশ ভাগ বিশ্বাস রয়েছে যে ছবি সফল হবে, নায়িকা হবে আমার স্ত্রী।

সাঈদ জিজ্ঞেস করলো, আপনার স্ত্রী?

—জী হ্যাঁ।

—আগে কোন ছবিতে কাজ করেছে?

প্যাডে ফুলের শাখা আঁকতে আঁকতে জহির বললো, জী না। আমি লাহোরে এসে বিয়ে করেছি। ছবির লাইনে ওকে আনার আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তার খুবই সখ। প্রতিদিন একটি করে ছবি দেখে। আপনাকে আমি ওর ছবি দেখাচ্ছি।

জহির টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করে তা থেকে একটা খাম বের করে স্ত্রীর ফটো সাঈদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

সাঈদ ছবি দেখলো, সাদামাটা চেহারার একটা যুবতী মেয়ে। ছোট মাথা, সরু নাক, মোটা ঠোঁট, ডাগর ডাগর চোখে উদাস দৃষ্টি। তার চেহারার মধ্যে চোখ দুটোই আকর্ষণীয়।—সাঈদ ভালভাবে দেখবে মনে করেছিল কিন্তু আগ্রহবোধ করলো না, টেবিলের উপর ছবিটা রেখে দিল।

জহির জিজ্ঞেস করলো, আপনার মতামত কি?

সাঈদের কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব ছিল না। তার মনে মগজে তখন ডাগর ডাগর চোখ দুটি ছেয়ে আছে। নিজের অজ্ঞাতে আবার ফটোটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে টেবিলের উপর রেখে বললো, আপনিই ভাল জানেন।

জহির প্যাডে আর একটা ফুল আঁকতে আঁকতে বললো, ফটোটা ভাল ওঠেনি, একদিকে কাত হয়ে বসেছিল।

এ সময়ে পেছনের দরজার পর্দা সরিয়ে জহিরের স্ত্রী প্রবেশ করলো। সেই ডাগর ডাগর চোখের উদাস চাহনি। জহির তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললো, আজব ধরনের নাম ওর—বিস্‌মিল্লাহ। তারপর সাঈদের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, ইনি আমার বন্ধু সাঈদ সাহেব।

বিসমিল্লাহ বললো, আদাব।

বিসমিল্লাহ দোপাট্টার আঁচল ঠিক করে সাঈদের পাশের চেয়ারে বসলো। মিহিন দোপাট্টার আড়ালে তার বুক উঁকি দিচ্ছে। সাঈদ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

জহির খামের ভেতর ছবি রেখে সাঈদকে বললো, বিসমিল্লাহর প্রথম ছবিই সফল প্রমাণিত হবে এ ব্যাপারে আমি একশ ভাগ নিশ্চিত। কিন্তু ওর ফিল্মী নাম কি রাখবো বুঝতে পারছি না। বিসমিল্লাহ মানানসই নয়, আপনার কি ধারণা?

সাঈদ বিসমিল্লাহর দিকে তাকালো। তার ডাগর ডাগর উদাস চোখ মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠলো। জহিরকে সে বললো, জী হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ ঠিক মনে হচ্ছে না। অন্য নাম হওয়া চাই।

কিছুক্ষণ যাবত এদিক ওদিকের কথা হলো। বিসমিল্লাহ চুপচাপ বসে রইলো। তার ডাগর ডাগর চোখও নীরব। সাঈদ এ সময়ে কয়েকবার তার দিকে আড়চোখে তাকালো। সাঈদ ও জহির আলাপ করছিলো।

বিসমিল্লাহর রং গাঢ় শ্যামলা, ছবিতে তার রং বোঝা যাচ্ছে না।

বাস্তবে তার চোখের উদাসীনতার প্রতি তাকিয়ে সাঈদ ভাবলো, এ উদাসীনতার অর্থ কি? কিন্তু কোন জবাব খুঁজে পেল না। এটা সহজাত, নাকি এ উদাসীনতার কোন কারণ রয়েছে, সাঈদ বুঝতে পারলো না।

জহির বোম্বের কথা শুরু করতে যাবে এমন সময় বিসমিল্লাহ চটে চলে গেল। উঁচু গোড়ালী যুক্ত চপ্পল প্রথম প্রথম ব্যবহারের মতো তার হাঁটার মধ্যে কেমন একটা ঢং রয়েছে। তার গভীর শ্যামলা

চেহারার মধ্যে বড় বড় দুটি চোখে উদাসীনতার সাথে সাথে কেমন যেন চাপা রহস্য লুকিয়ে আছে।

কয়েকবারের সাক্ষাতের পরই জহিরের সাথে সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লো। জহিরের মন ছিল খুবই সরল। সাঈদ এতে খুবই প্রভাবিত হলো। তার কোন কথাই বানোয়াট নয়। মনে যা আছে মুখে তা সহজে প্রকাশ করে দেয়। থাকা খাওয়ার ব্যাপারেও সে খুবই সাদাসিদে।

সাঈদ দেখা করতে গেলেই জহির আদর আপ্যায়ন করতো। সাঈদ কয়েকবার নিষেধ করলো কিন্তু জহির শুনলো না। সে বলতো, আরে সংকোচ করেন কি, এতো আপনার নিজের ঘর।

জহিরের কাছে প্রায় প্রতিদিনই যেতে শুরু করলো একদিন। সাঈদ ভাবলো, এটা খুবই খারাপ কথা। সে আমাকে এতো সম্মান করে, বন্ধু মনে করে আর ওর স্ত্রীকে ভাল লাগার কারণে ওর সাথে আমি সাক্ষাৎ করছি—এটা সমীচীন নয়। বিবেকের বিরুদ্ধেও সে নিয়মিত যাতায়াত করতে লাগলো। বিসমিল্লাহ প্রায়ই আসতো, প্রথম দিকে চুপচাপ বসে থাকতো। পরে কিছু কথা বলতো। কিন্তু কথা বলার নিয়মকানুন মনে হয় সে জানতো না। সাঈদের দুঃখ হতো যে, সে ভালভাবে কথা বলতে জানে না কেন?

মাঝে মাঝে সাঈদের বাসায় যাওয়ার পর জহিরকে পাওয়া যেত না, সে বাইরে থাকতো। দরজায় আওয়াজ দিলে বিসমিল্লাহ ভেতর থেকে বলতো—বাইরে গেছেন। সাঈদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতো, তাকে ভেতরে ডেকে বসিয়ে বলবে, বসুন, উনি এক্ষুণি আসবেন। কিন্তু তা কখনো বলেনি।

জহির ছবি তৈরীর ধান্দায় ব্যস্ত থাকতো। প্রায় প্রতিদিন এ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনাও হতো। জহির বলতো, আমি তাড়াতাড়ি করার পক্ষপাতি নই, সবকিছু ধীরে ধীরে হলেই ভালভাবে সম্পন্ন হয়।

জহিরের ছবির ব্যাপারে সাঈদের কোন আকর্ষণ ছিল না, কয়েকবার চোখাচোখি হওয়ায় বিসমিল্লাহর চোখ দুটির আকর্ষণেই সে ওখানে যেতো। তার এ আকর্ষণ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাঈদের

ভাবতে খারাপ লাগতো যে, সে আসলে বন্ধুর স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী।

দিন কেটে যেতে লাগলো, কিন্তু জহিরের ছবি তৈরীর কাজ এগুলো না। একদিন সাক্ষাৎ করতে গিয়ে সাঈদ জহিরকে না পেয়ে ফিরে আসতে চাচ্ছিল, এমন সময় বিসমিল্লাহ বললো, ভেতরে আসুন, তিনি দূরে কোথাও যাননি।

সাঈদের বুক কাঁপতে লাগলো। কিছুক্ষণ চিন্তা করে দ্বিধান্বিতভাবে সে কামরায় প্রবেশ করে চেয়ারে বসে পড়লো। বিসমিল্লাহ টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সাঈদ সাহস করে বললো, বসুন।

বিসমিল্লাহ মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলো। বিসমিল্লাহর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, জহির তো এখনো এলেন না।

বিসমিল্লাহ সংক্ষেপে বললো, এসে যাবেন।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে বসে রইলো। এ সময়ে সাঈদ কয়েকবার বিসমিল্লাহর চোখের দিকে তাকালো। তার মন চাইলো উঠে গিয়ে ওকে চুমোয় চুমোয় ভরে দেয়, এবং তার উদাসীন ভাব ধুয়ে মুছে ফেলে। কিন্তু সাঈদ নিজের ইচ্ছা সংযত করে শুধু বললো, ছবিতে কাজ করার খুব ইচ্ছে আপনার?

বিসমিল্লাহ হাই তুলে বললো, তা আছে।

সাঈদ উপদেশের সুরে বলতে লাগলো, এ লাইন ভালো নয়। আমি বলতে চাচ্ছি যে এ লাইনের দুর্ণাম অনেক। তারপর সে চিত্র-জগতের খারাপ দিক সম্পর্কে বলতে শুরু করলো। জহিরের কথা মনে আসতেই সে কথার মোড় ঘুরিয়ে বললো, আপনার ইচ্ছে হয়েছে তো সেটা অন্য কথা। চরিত্র দৃঢ় থাকলে মানুষ যে কোন লাইনেই টিকে থাকতে পারে। তাছাড়া জহির নিজেই ছবি তৈরী করছেন। তবে আপনি অন্য কারো ছবিতে কিছুতেই কাজ করবেন না।

বিসমিল্লাহ চুপ করে রইলো। তার এ নীরবতায় সাঈদের খুবই খারাপ লাগলো। এই প্রথম ওর সাথে একাকী সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছে অথচ সে কথাই বলছে না। সাঈদ ভয়ে ভয়ে ওর দিকে

তাকালো কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সাঈদ বিসমিল্লাহকে বললো, আচ্ছা তাহলে পান খাওয়ান।

বিসমিল্লাহ উঠলো, রেশমী দোপাট্টার আড়ালে তাঁর উঁচু বুক স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সাঈদের চোখে যেন ধাক্কা লাগলো। বিসমিল্লাহ অন্য কামরায় যাওয়ার পর সাঈদ ভয়ে ভয়ে নানা আজেবাজে কথা ভাবতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর পান নিয়ে এসে সাঈদের কাছে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ বললো, নিন। সাঈদ ধন্যবাদ জানিয়ে পান নেয়ার সময় বিসমিল্লাহর আঙুলের সাথে তার আঙুল ছুঁয়ে গেল। তার সারা দেহে শিহরণ খেলে গেল, কিন্তু বিবেকের চোখ রাঙ্গানিতে সে সংযত হলো।

বিসমিল্লাহ সামনের চেয়ারে বসলো। তার গভীর শ্যামলা চেহারার দিকে তাকিয়েও সে কিছু আঁচ করতে পারছিল না। সাঈদ ভাবলো, অন্য কোন নারী হলে বুঝতে পারতো আমি ওকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখছি। কিন্তু সে কি কিছুই বুঝতে পারেনি!

সাঈদ মানসিক অস্থিরতায় ভুগছিল। এ দিকে বিসমিল্লাহর দেহ, তার ডাগর চোখ, বুকের উচ্চতা, অন্যদিকে জহিরের চিন্তা তার বিবেকে কাঁটার মতো বিঁধছে। সাঈদ আজব দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লো। বিসমিল্লাহ কোন ইঙ্গিত করছিল না, এর স্পষ্ট অর্থ হলো সাঈদ যা ভাবছে সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু তবুও সাঈদ ওকে একই দৃষ্টিতে দেখছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সাঈদ বললো, জহির সাহেব এলেন না, মনে হয় আমার চলে যাওয়াই ভালো।

অপ্রত্যাশিতভাবে বিসমিল্লাহ বললো, না না, বসুন।

আপনি কোন কথাই বলছেন না!—এই বলে সাঈদ উঠে দাঁড়ালো।

বিসমিল্লাহ জিজ্ঞেস করলো, চললেন?

সাঈদ তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, জী না, আপনার আপত্তি না থাকলে বসতে পারি। বিসমিল্লাহ একটা হাই তুলে বললো, আমার আপত্তির কি থাকবে?

বিসমিল্লাহর ঈষৎ লাল চোখের দিকে তাকিয়ে সাঈদ বললো,

সম্ভবত ঘুম পাচ্ছে আপনার।

বিসমিল্লাহ বললো, জী হ্যাঁ, রাতে জাগতে হয়েছিল।

সাঈদ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো, কেন?

বিসমিল্লাহ আর একটা হাই তুলে বললো, বাইরে যেতে হয়েছিল।

সাঈদ বসে রইলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বিসমিল্লাহ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তার বুক ওঠা-নামা করছে। ডাগর ডাগর উদাস চোখ এখন মুদিত, ডান হাত একপাশে ঢলে পড়ে আছে, জামার আস্তিন কিঞ্চিৎ উপরে উঠে আছে। সাঈদ একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, এমন সময় জহির এসে পড়লো।

জহির আসতেই সাঈদ ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। জহির তার সাথে করমর্দন করলো। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, আরে, ঘুমুচ্ছে?

সাঈদ বললো, আমি যাচ্ছিলাম, বললেন যে, জহির সাহেব এক্ষুনি আসবেন। আপনি বসুন। আমি বসলাম, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

জহির হাসলো, সাঈদও হাসতে লাগলো। বিসমিল্লাহর মাথায় হাত বুলিয়ে জহির বললো, আরে, ওঠো ওঠো।

বিসমিল্লাহ একটা শব্দ করে চোখ মেললো, উদাসীনতার সাথে সাথে তার চোখে কেমন যেন একটা বিরূপভাব ছেয়ে আছে। জহির বিসমিল্লাহকে বললো, চল চল, ওঠো একটা জরুরী কাজে যেতে হবে। সাঈদকে বললো, মাফ করবেন সাঈদ সাহেব, একটা কাজে বাইরে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ কাল দেখা হবে।

সাঈদ চলে গেল। পরদিন জহিরের বাসায় যাওয়ার আগে সে মনে মনে কামনা করলো জহির যেন ঘরে না থাকে। কিন্তু গিয়ে দেখলো বাইরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, বিসমিল্লাহ জহিরের স্ত্রী নয়, একটা হিন্দু মেয়ে। দাঙ্গার সময় এখানে আটকা পড়েছে। জহির ওকে দিয়ে পেশা করাচ্ছে। পুলিশ এক্ষুনি ওদের হাজতে নিয়ে গেল। সাঈদ অনুভব করলো, ডাগর ডাগর উদাস চোখ দুটি তাকে তাড়া করছে।

শান্তি

ওরা উভয়ে পীরে সুরেন ডেয়ারীর বাইরে শামিয়ানা টাঙ্গানো ছাদের নীচে চেয়ারে বসে চা পান করছিল। একদিকে সমুদ্র। সে সমুদ্রের ঢেউ-এর গর্জন শোনা যাচ্ছে। চা ছিল গরম, এজন্যে উভয়ে ধীরে ধীরে পান করছে। সামনে মোটা-সোটা ইহুদী মহিলার চেনা পরিচিত চেহারা। গোলগাল চেহারা, তীক্ষ্ণ নাক, মাত্রাছাড়া রং লাগানো ঠোঁট। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রেস্টুরেন্টের মাঝামাঝি স্থানের একটা চেয়ারে তাকে বসে থাকতে দেখা যায়। মকবুল ওর প্রতি এক নজর তাকিয়ে বেলোরাজকে বললো, বসে আছে জাল পেতে।

বেলোরাজ মোটা ইহুদিনীর প্রতি না তাকিয়েই বললো, ফেঁসে যাবে কোন না কোন মাছ!

মকবুল একটা পেস্ট্রি, মুখে দিয়ে বললো, এ কারবারটাও অদ্ভুত। কেউ দোকান খুলে বসে থাকে, কেউ হেঁটে চলে পণ্য বিক্রি করে। কেউবা আবার রেস্টুরেন্টে বসে থাকে ক্রেতার অপেক্ষায়। দেহ বিক্রিও একটা আর্ট, আমার মতে খুবই কষ্টকর আর্ট। এ মোটা ইহুদী নারী ক্রেতাদের কি করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে? পুরুষদের কিভাবে বোঝায় যে সে বিক্রয়যোগ্য?

বেলোরাজ হেসে বললো, একদিন সময় করে কিছুক্ষণ এখানে বসে থেকো, তাহলে বুঝতে পারবে দৃষ্টি-বিনিময়ের দ্বারা কি করে বিকিকিনি হয়ে যায়। এ জাতীয় দ্রব্যের বিক্রয় ফর্মূলাও বুঝতে পারবে। এই বলে সে মকবুলের হাত ধরে বললো, ওদিকে তাকিয়ে দেখ, ওদিকে।

মকবুল মোটা ইহুদিনীর প্রতি তাকালো।

বেলোরাজ বললো, এদিকে নয় বন্ধু, ঐ কোণের দিকে তাকাও।

মকবুল তাকিয়ে দেখলো একটা হাল্কা পাতলা উজ্জ্বল গৌর-বর্ণের মেয়ে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। ছোট চুল, চলনসই চেহারা। হালকা নীল রঙের জর্জেট শাড়ী পরনে। মকবুল বেলো-

রাজকে জিজ্ঞেস করলো, কে এই মেয়ে ?

বেলোরাজ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো, ওর সম্পর্কেই তোমাকে বলছিলাম যে অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে।

মকবুল কিছুক্ষণ ভেবে বললো, যে মেয়ের সাথে মেলামেশা করো তাকেই তুমি বলো অদ্ভুত চমৎকার।

বেলোরাজ হেসে বললো, ও কিন্তু বিশেষদের মধ্যেও বিশেষতর। একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখো।

মকবুল গভীর দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকালো। লালচে ধরনের চুল, হাল্কা বাসন্তী রঙের শাড়ীর নীচে ছোট আস্তিনের ব্লাউজ। গৌরবর্ণ হাল্কা ধরনের বাহু। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে মকবুল দেখলো ওর ঠোঁটে লিপস্টিকের হাল্কা প্রলেপ। মকবুল বললো, আমি অন্য কিছু বলতে পারবো না, তবে তোমার এ অদ্ভুত মেয়ে কিন্তু প্রসাধনী ব্যবহারের কায়দাই রপ্ত করতে পারেনি। ভালভাবে তাকালে বোঝা যাবে যে ওর শাড়ী পরিধানও ত্রুটিপূর্ণ। চুল আঁচড়াবার কায়দাও যথাযথ নয়।

বেলোরাজ হেসে বললো, তুমি শুধু ত্রুটিগুলোই দেখ, ভালোর দিকে তোমার চোখই যায় না।

মকবুল বললো, ভালোর দিকটা তুমি বলে দাও। তবে আগে বলো যে এ মেয়েকে তুমি ব্যক্তিগতভাবে চেনো কিনা।

মেয়েটি বেলোরাজের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

মকবুল বললো, জবাব পেয়ে গেছি, এবার তুমি মাননীয়ার গুণাবলী প্রকাশ কর।

বেলোরাজ বললো, স্পষ্টবাদিতা ওর সবচেয়ে বড় গুণ। কথনো মিথ্যে কথা বলে না। নিজের জন্যে নির্ধারণ করা নীতি নিষ্ঠার সাথে পালন করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। প্রেম ভালবাসার ধার ধারে না। এ ব্যাপারে তার মন বরফের মতো শীতল। এখন বল তোমার কি খেয়াল ?—বেলোরাজ চায়ে শেষ চুমুক দিল।

মকবুল এক নজর মেয়েটিকে দেখে বললো, যে গুণাবলীর কথা তুমি

প্রকাশ করেছ এসব এমন কোন মেয়ের মধ্যে থাকা উচিত্ নয় যার কাছে একজন পুরুষ অকৃত্রিম না হোক কৃত্রিম ভালবাসা পাওয়ার জন্যে গমন করে। আত্মপ্রতারণায় যদি এ মেয়ে পুরুষদের সহায়িকা না হয় তবে আমি বলবো ও আস্ত একটা নির্বোধ।

বেলোরাজ সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললো, তোমাকে কি বলবো, আমিও তাই ভেবেছি। আশ্চর্য রকমের স্পষ্টবাদী সে। তার সাথে কথা বললে তোমাকে অবাক হতে হবে। যেমন আমাকে হতে হয়েছিল। একদিন আমাকে বললো, একঘণ্টা হয়ে গেল, তুমি কোন কাজের কথা বললে না। আমি চললাম। আরে ধ্যেত তোমার মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে, যাও চলে যাও। শাড়ীতে হাত দেবে না, ময়লা হয়ে যাবে। অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে। প্রথমবারের সাক্ষাতের সময় আমি অপলকে তাকিয়ে রইলাম। এক সময়ে সে বললো, পঞ্চাশ থেকে এক পয়সা কমেও হবে না। পকেটে থাকে তো চলো, না হলে আমার অন্য কাজ আছে।

মকবুল জিজ্ঞেস করলো, কি নাম ওর?

বেলোরাজ বললো, আমাকে বলেছে—শান্তি, কাশ্মিরী মেয়ে।

—কাশ্মিরী! মকবুলের চোখে বিস্ময়।

বেলোরাজ বললো, তোমার স্বদেশিনী।

মকবুল ভালভাবে মেয়েটির দিকে তাকালো। গঠন প্রকৃতি কাশ্মিরীদের মতোই। বললো, এখানে এলো কেমন করে?

—জানি না।

—কোন আত্মীয়-স্বজন আছে?

মকবুল এসট্রেতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে বললো, কাশ্মীরে কেউ আছে কিনা বলতে পারি না, এখানে বোম্বেতে একাই থাকে। হারনেবি রোডের একটা হোটেলে কামরা ভাড়া নিয়েছে। ঘটনাক্রমে একদিন আমি এটা জেনে ফেলেছি। না হলে বাসার ঠিকানা কাউকে দেয় না। এখানে পীরে সুরেন ডেয়ারীতে প্রতিদিন ঠিক পাঁচটায় আসে। সাক্ষাৎকারীরা এখানেই সাক্ষাৎ করে।

মকবুল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বেয়ারাকে ডেকে বিল

আনতে বললো। এ সময় একটি সুবেশী যুবক এসে মেয়েটির কাছে চেয়ারে বসলো। উভয়ে কথা বলতে শুরু করলো। মকবুল বেলোরাজকে বললো, ওর সাথে এক সময় আলাপ করতে হবে।

বেলোরাজ হেসে বললো, অবশ্যই। কিন্তু এখন নয়। ব্যস্ত আছে। এক সময় বিকেলে এখানে এসে পাশে বসে যেয়ো।

মকবুল বিল পরিশোধ করলো। তারপর উভয় বন্ধু বেরিয়ে গেল।

পরদিন বিকেলে মকবুল এসে চায়ের অর্ডার দিয়ে বসে পড়লো। ঠিক পাঁচটায় মেয়েটি বাস থেকে নেমে পার্স ঝুলিয়ে মকবুলের পাশ দিয়ে গিয়ে সামনের একটা চেয়ারে বসলো। চালচলনে কেমন একটা আনাড়ীপনা। মকবুল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভাবলো, ওর মধ্যে যৌন আকর্ষণ তো নামমাত্রও নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওর ব্যবসা চলে কি করে। লিপস্টিক কি রকম অর্থহীনভাবে লাগিয়ে রেখেছে, শাড়ী পরার ঢং আজও ত্রুটিপূর্ণ। তারপর ভাবলো, কি করে ওর সাথে আলাপ শুরু করা যায়। ততক্ষণে চা এসে গেছে। তা না হলে মকবুল নিজেই উঠে গিয়ে মেয়েটির পাশে বসতো। মকবুল চায়ে চুমুক দিয়ে হাল্কা ইশারায় মেয়েটিকে ডাকলো। মেয়েটি কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে মকবুলের সামনের চেয়ারে এসে বসলো। মকবুল কিছুটা আতঙ্কিত হলো। সে-ভাব কাটিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, চা খাবেন আপনি?

—না।

সংক্ষিপ্ত রুক্ষ জবাব শুনে কিছুক্ষণ নীরব থেকে মকবুল বললো, কাশ্মীরীদের চায়ের অভ্যাস থাকে।

মেয়েটি অভদ্রভাবে সরাসরি বললো, তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে?

মকবুলকে কে যেন গলাধাক্কা দিয়ে উপুড় করে ফেলে দিয়েছে। ভয়ার্তভাবে সে শুধু বললো, হ্যাঁ।

মেয়েটি বললো, ফিফটি রুপিজ, ইয়েস আর নো?

মকবুল কিছুটা দ্বিধান্বিতভাবে বললো, চলুন।

মকবুল চায়ের পয়সা চুকিয়ে দিল, তারপর উভয়ে উঠে ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডে চলে গেল। পথে কোন কথা হলো না। মেয়েটিও চুপ

করে রইলো। ট্যাক্সীতে বসে মেয়েটি বললো, কোথায় যাবে তুমি?

মকবুল জবাব দিল, যেখানে তুমি নিয়ে যাবে।

মেয়েটি বললো, আমি কিছু জানি না, তুমি বল কোনদিকে যাবে?

মকবুল কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। বললো, আমি কিছু জানি না।

শান্তি ট্যাক্সীর দরজা খুলতে হাত বাড়িয়ে বললো, কেমন মানুষ তুমি? শুধু শুধু জোক করো।

মকবুল শান্তির হাত ধরে বললো, আমি জোক করছি না, আমি শুধু তোমার সাথে কথা বলতে চাই।

শান্তি রুক্ষভাবে বললো, তুমি না বলেছিলে ফিফটি রুপিজ ইয়েস?

মকবুল পকেটে হাত দিয়ে দশ টাকার পাঁচটা নোট বের করে দিয়ে বললো, এই নাও, ভয় পাচ্ছ কেন?

শান্তি নোটগুলো নিয়ে বললো, তুমি যাবে কোনদিকে?

মকবুল বললো, তোমার বাসায়।

—না।

—কেন?

—তোমাকে বলছি যে ওদিকে এসব হবে না।

মকবুল হেসে বললো, ওদিকে এসব হবে না?

শান্তি বিস্মিত হয়ে বললো, কেমন মানুষ তুমি?

মকবুল বললো, যেমন আছি তেমনি। তুমি বলেছ ফিফটি রুপিজ ইয়েস, নাকি নো? আমি বলেছি, ইয়েস এবং তোমাকে টাকা দিয়ে দিয়েছি। তুমি বলছো, ওদিকে এসব হবে না।

আমি বলছি, মোটেই হবে না। এখন আর কি বলতে চাও?

শান্তি কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলো। মকবুল হেসে বললো, দেখ শান্তি, কথা হলো যে, গতকাল তোমাকে দেখেছি। এক বন্ধু তোমার সম্পর্কে কিছু কথা শুনিয়েছে। কথাগুলো আমার ভাল লেগেছে। আজ তোমাকে পাকড়াও করেছি। এখন তোমার বাসায় যেতে চাচ্ছি। ওখানে কিছুক্ষণ তোমার সাথে কথা বলবো। তারপর চলে যাব। তুমি কি রাজী নও?

না, এই নাও ফিফটি রুপিজ।—মেয়েটির চেহারায় ক্রোধের ছাপ ফুটে উঠলো।

মকবুল বললো, তুমি শুধু টাকাই চিনেছ, টাকা ছাড়াও পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে। চলো, ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে দাও। আমি ভদ্র মানুষ। তোমার সাথে কোন প্রতারণা করবো না।—মকবুলের কথা বলার ভঙ্গিতে মেয়েটি প্রভাবিত হলো। কিছুক্ষণ ভেবে বললো, চলো ড্রাইভার, হারনেবি রোড।

ট্যাক্সী চলতে শুরু করলে শান্তি টাকাগুলো মকবুলের পকেটে দিয়ে বললো, এ টাকা আমি নেব না।

মকবুল প্রতিবাদ করলো না। শুধু বললো, তোমার মর্জি।

ট্যাক্সী একটা পাঁচতলা বাড়ীর সামনে গিয়ে থামলো। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় হোটেল। সংকীর্ণ জায়গা—চতুর্থ তলার সিঁড়ির পাশের কামরায় শান্তি থাকে। পার্স থেকে চাবি বের করে সে তালা খুললো। সংক্ষিপ্ত জিনিসপত্র। লোহার একটা পালঙ্কের উপর উজ্জ্বল চাদর বিছানো। এককোণে একটা ড্রেসিং টেবিল। একটা বেঞ্চিতে একটা টেবিল ফ্যান। পালঙ্কের নীচে চারটা ট্রাঙ্ক।

মকবুল কামরার পরিচ্ছন্নতায় প্রভাবিত হলো। সবকিছু পরিচ্ছন্ন পরিপাটি। বালিশের কভার থাকে সাধারণত অপরিষ্কার, কিন্তু শান্তির দুটো বালিশের কভারই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মকবুল পালঙ্কের ওপর বসতে চাইলে শান্তি তাকে বাধা দিয়ে বললো, না, এদিকে বসার অনুমতি নেই। আমি কাউকে নিজের বিছানায় বসতে দিই না। চেয়ারে বসো।—এই বলে সে নিজে পালঙ্কের ওপর বসলো। মকবুল একটু হেসে চেয়ারে বসে পড়লো।

শান্তি বালিশের নীচে পার্স রেখে বললো, বল কি কথা বলতে চাও?

মকবুল শান্তির প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, প্রথম কথা হলো, তুমি ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতেই জানো না।

শান্তি কিছু মনে করলো না। শুধু বললো, আমি জানি।

ওঠো, আমাকে লিপষ্টিক দাও। আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। —এই বলে মকবুল রুমাল বের করলো।

শান্তি বললো, ড্রেসিং টেবিলে পড়ে আছে, তুলে নাও।

মকবুল লিপষ্টিক নিয়ে খুলে দেখলো। তারপর বললো, এদিকে এসো, তোমার ঠোঁট মুছে দিই।

উঁহু, তোমার রুমাল দিয়ে নয়, আমারটি নিয়ে নাও।—এই বলে ট্রাঙ্ক খুলে ইস্ত্রি করা একটা রুমাল বের করে মকবুলকে দিল। মকবুল শান্তির ঠোঁট মুছে তাতে আলতো করে লিপষ্টিক লাগালো। তারপর চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিয়ে বললো, যাও এবার আয়না দেখো।

শান্তি উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। গভীর দৃষ্টিতে সে নিজের ঠোঁট ও চুল পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর স্মিতমুখে মকবুলের দিকে তাকিয়ে বললো, ঠিক আছে। পালঙ্কের উপর বসতে বসতে বললো, তোমার কোন বউ আছে?

মকবুল বললো, না।

উভয়ে চুপ করে রইলো। মকবুল চাচ্ছিল যে কিছু কথা হোক। এজন্যে কথা শুরু করে বললো, আমি এটা জানি যে তুমি কাশ্মীরের অধিবাসী। তোমার নাম শান্তি, এখানে থাকো। কিন্তু বল দেখি তুমি ফিফটি রুপিজ-এর কাণ্ড শুরু করলে কেন?

শান্তি অসংকোচে বললো, আমার আব্বা শ্রীনগরে ডাক্তারী করেন। ওখানের হাসপাতালে আমি নার্স-এর কাজ করতাম। একটা ছেলে আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর আমি এখানে পালিয়ে এসেছি। এখানে একটা লোক পেলাম। সে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে। দেখা হওয়ার পর বললো—আমার সাথে চল। আমি গেলাম। কাজ হলো। তারপর আমি এখানে হোটেলে ফিরে এলাম। এখানে আমি কারো সাথে কথা বলি না। সব বেশ্যারা থাকে। কাউকে আমার ঘরে আসতে দিই না।

মকবুল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ঘটনা জানা সমীচীন মনে করলো না। আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর মকবুল বুঝতে পারলো যে, যৌন ব্যাপারে শান্তির কোন আকর্ষণ নেই। যৌন প্রসঙ্গ উঠলে শান্তি মুখ

বিকৃত করে বললো, আই ডোণ্ট লাইক, ইট ইজ ব্যাড।

তার কাছে পঞ্চাশ টাকার ব্যাপার ছিল একটা ব্যবসায়িক ব্যাপার। শ্রীনগরের হাসপাতালের ঘটনার পর সেই ছেলে তাকে দশ টাকা দিতে চাইলে শান্তি ক্রোধে অধীর হয়ে টাকা ছিঁড়ে ফেলেছে। এ ঘটনায় এতো বেশী প্রভাবিত হয়েছিল যে সে রীতিমত ব্যবসা শুরু করে দিল। পঞ্চাশ টাকা ফি আপনা-আপনি ধার্য হয়ে গেল। আনন্দের প্রশ্ন এখন তো আর উঠেই না। আগে যেহেতু নার্স ছিল এজন্যে সবসময়ে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি থাকতো।

তার বোম্বে আসার পর এক বছর কেটে গেছে। এ সময়ে সে অনেক টাকা সঞ্চয় করতে পারতো। কিন্তু তার রেস খেলার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। বিগত এক রেসে সে পাঁচ হাজার টাকা হেরে গিয়েছিল। কিন্তু তার বিশ্বাস আগামী কোন এক রেসে জিতে গিয়ে সব ক্ষতি পুষিয়ে নেবে। তার কাছে প্রতিটি পয়সা ব্যয়ের হিসেব রয়েছে। দৈনিক একশ টাকা উপার্জন করে এবং সে টাকা পরদিন সকালে ব্যাংকে জমা দিয়ে দেয়। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার কারণে দৈনিক একশ টাকার বেশী উপার্জন করতে চায় না।

দু'ঘণ্টা কেটে যাবার পর ঘড়ি দেখে সে মকবুলকে বললো, এবার তুমি যাও। আমি খাবার খেয়ে ঘুমোব। মকবুল উঠে যেতে শুরু করলে শান্তি বললো, কথা বলতে হলে সকালের দিকে এসো, সন্ধ্যায় এলে আমার ক্ষতি হয়।—মকবুল 'আচ্ছা' বলে চলে গেল।

পরদিন সকাল দশটার দিকে মকবুল শান্তির কাছে গেল। তার ধারণা ছিল যে, শান্তি তার যাওয়া হয়তো পছন্দ করবে না। কিন্তু সে রকম কোন ভাব প্রকাশ করলো না। মকবুল দীর্ঘক্ষণ তার কাছে বসে রইলো। এ সময়ে শান্তিকে ভালভাবে কাপড় পড়া শেখালো। মেয়েটি মেধাবী হওয়ায় সহজেই তা রপ্ত করে ফেললো।

শান্তির কাছে প্রচুর ভাল ভাল শাড়ী ছিল। মকবুলকে সবগুলো সে দেখালো। শান্তিকে দেখে মনে হতো, সে বৃদ্ধাও নয় যুবতীও নয়। কিছু হতে হতে যেন একদম থেমে গেছে। এমন এক জায়গায় পৌঁচেছে যা কিনা নির্ধারণ করা মুশকিল। তাকে কুৎসিতও বলা

যায় না, সুন্দরীও বলা যায় না। নারীও নয় বালিকাও নয়, ফুলও নয়, কলিও নয়। শাখাও নয় পাতাও নয়, মকবুল শান্তিকে নিয়ে প্রায়ই ভেবে কাটাতো।

শান্তির সম্পর্কে আরো অধিক জানার জন্যে মকবুল প্রত্যেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন তার সাথে দেখা করতে শুরু করলো। শান্তি মকবুলকে আদর আপ্যায়ন করতো না বটে তবে ইদানীং সে মকবুলকে তার বিছানায় বসার অনুমতি প্রদান করেছিল। একদিন মকবুলকে শান্তি জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি কোন মেয়ে চাই ?

মকবুল শুয়ে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, কি বললে ?

শান্তি বললো, বলছিলাম যদি তোমার কোন মেয়ের প্রয়োজন থাকে তবে আমি এনে দিতাম।

মকবুল জিজ্ঞেস করলো, বসে থেকে থেকে তোমার মাথায় এ খেয়াল জাগলো কেন? শান্তি কোন জবাব দিল না। মকবুলের বারবার জিজ্ঞেসের পর শান্তি জানালো যে মকবুল তাকে একটা নিকর্ম মেয়ে মনে করে। সে নিজেও ভেবে অবাক হচ্ছে যে, এতো শীতল মনে করা সত্বেও পুরুষরা তার কাছে আসছে কেন? মকবুল কাছে এসে কথা বলে চলে যায়। সে তাকে একটা খেলনা ছাড়া আর কিছু মনে করে না। এ কারণে আজ তার মনে খেয়াল জেগেছে যে সব মেয়ে তো আর তার মতো নয়। মকবুলের নারীর প্রয়োজন। এজন্যে সে তাকে একটা নারী আনিয়ে দিতে চায়। প্রথমবারের মতো মকবুল শান্তির চোখে অশ্রু দেখলো। আরো দেখলো যে, শান্তি উঠে চীৎকার করতে শুরু করেছে, আমি কিছুই নই—যাও চলে যাও। তুমি কেন আমার কাছে আসো—যাও।

মকবুল কিছু বললো না। নীরবে উঠে চলে গেল।

তারপর ক্রমাগত এক সপ্তাহ পীরে সুরেন ডেয়ারীতে যেতে শুরু করলো। কিন্তু শান্তিকে দেখতে পেল না। অবশেষে একদিন সকালে তার হোটেলের কামরায় গিয়ে হাজির হলো। শান্তি দরজা খুলে দিল, কিন্তু কোন কথা বললো না। মকবুল চেয়ারে বসলো। শান্তির ঠোঁটে লিপষ্টিকের রঙ ফিকে হয়ে আছে। মাথার চুল এলোমেলো।

শাড়ী পরার ঢং-ও অগোছালো। মকবুল তাকে বললো, আমার উপর রেগে আছো?

শান্তি কোন জবাব না দিয়ে পালঙ্কের উপর বসলো। মকবুল রুক্ষভাবে বললো, আমি যা শিখিয়েছি, তা কি ভুলে গেছ? শান্তি চুপ করে রইলো। মকবুল ক্রুদ্ধভাবে বললো, জবাব দাও, না হলে মার খাবে।

শান্তি বললো, মারো।

মকবুল উঠে শান্তির গালে সজোরে একটা চড় কষে দিল। শান্তি কঁকিয়ে উঠলো। তার বিস্মিত চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মকবুল পকেট থেকে রুমাল বের করে শান্তির ঠোঁটের ফিকে লিপষ্টিক মুছে দিল। শান্তি প্রতিবাদ করলো, কিন্তু মকবুল তার কাজ করতে লাগলো। তারপর লিপষ্টিকের কৌটো তুলে নতুন লিপষ্টিক লাগিয়ে দিল। চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিল। চুল আঁচড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বললো, এবার শাড়ী ঠিক করো।

শান্তি উঠে শাড়ী ঠিক করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ অস্ফুটে কান্না জুড়ে দিল এবং কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। মকবুল চুপচাপ বসে রইলো। শান্তির কান্নার বেগ কিছুটা কমে এলে তার কাছে গিয়ে মকবুল, বললো ওঠো শান্তি, আমি চলে যাচ্ছি।

শান্তি দ্রুত পার্শ্ব পরিবর্তন করে চীৎকার করে বললো, না না, তুমি যেতে পারবে না।—চকিতে পালঙ্ক থেকে উঠে দরজায় দু'হাত প্রসারিত করে বললো, তুমি যদি যাও, তবে মেরে ফেলব।—বলতে বলতে সে হাঁপাচ্ছিল। তার বুক—যে বুকের প্রতি মকবুল কখনো লক্ষ্যই করেনি মনে হলো যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠার চেষ্টা করছে। মকবুলের বিস্মিত চোখের সামনে শান্তি উপরে নীচে কয়েকবার রঙ পরিবর্তন করলো। তার ভেজা চোখ চমকাচ্ছে। লিপষ্টিক-রাঙা ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপছে। মকবুল সামনে এগিয়ে শান্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর উভয়ে পালঙ্কে বসলে শান্তি মকবুলের কোলে মাথা রাখলো। তার অশ্রু কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিলো না। মকবুল তাকে আদর করলো। কান্না বন্ধ করতে বললো। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, ওদিকে—শ্রীনগরে

একটা লোক আমাকে মেরে ফেলেছে—এদিকে একটা লোক আমাকে জীবিত করে দিয়েছে।

দু'ঘণ্টা পর খাওয়ার সময়ে মকবুল পকেট থেকে পঞ্চাশটি টাকা বের করে শান্তির পালঙ্কের উপর রেখে হেসে বললো, এই নাও তোমার ফিফটি রুপিজ।

শান্তি প্রবল ক্রোধ ও ঘৃণার সাথে নোটগুলো তুলে ছুঁড়ে ফেললো। তারপর দ্রুত ড্রেসিং টেবিলের একট ড্রয়ার খুলে মকবুলকে বললো এদিকে এসো, দেখো এখানে কি।

মকবুল দেখলো ড্রয়ারে একশ টাকার নোটের কয়েকটি ছেঁড়া টুকরো। সে টুকরোগুলো মুঠোয় নিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে মকবুলকে বললো, এখন আর আমি এগুলো চাই না।

মকবুল হাসলো। তারপর শান্তির গালে আলতো টোকা দিয়ে বললো, এখন তুমি কি চাও ?

শান্তি বললো, তুমিই বল।—এই বলে সে মকবুলের সাথে লেপ্টে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলো।

মকবুল শান্তির চুলে আঙ্গুলের চিরুণী চালিয়ে সোহাগভরা কণ্ঠে বললো, কেঁদো না। তুমি যা চেয়েছ, তা পেয়ে গেছো।

●

মজিদের অতীত

মাসিক আয় আড়াই হাজার টাকা। গাড়ী বাড়ী বউ আছে। এ ছাড়া দশ-পনের জন মহিলার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও রয়েছে। কিন্তু কখনো তিন-চার পেগ হুইস্কি খেলেই তার অতীতের কথা মনে পড়ে যায়। সে ভাবে, এখন থেকে পনের বছর আগে যতোটা সুখী ছিল এখন সে ততোটা সুখী নয়। অথচ তার কাছে তখন গাড়ী বাড়ী স্ত্রী তো ছিলই না, কোন নারীর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ছিল না। এখন আড়াই হাজার টাকা উপার্জন করে। এ টাকা নিঃসন্দেহে মোটা অঙ্ক। অথচ তখন তার উপার্জন ছিল মাসিক মাত্র ষাট টাকা। এ টাকায় তাকে অনেক কষ্ট করে চলতে হতো। তবু সে ছিল খুবই সুখী। অনেক কিছু না থাকা সত্বেও ভালভাবেই তার দিন কেটে যেতো। অথচ এখন তার অনেক চিন্তা—বাড়ীর চিন্তা, বউ-এর চিন্তা, ছেলেমেয়ের চিন্তা, অতিরিক্ত মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাতের চিন্তা, ইনকাম ট্যাক্সের চিন্তা। সেলস ট্যাক্স-এর চিন্তা। এ ছাড়াও আরো অনেক সমস্যা, যা থেকে মজিদ কখনোই মুক্তি পাচ্ছিল না। এজন্যে অতীতের চিন্তামুক্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের কথা তার প্রায়ই মনে পড়তো। তখন সে দারিদ্র্যক্লিষ্ট অথচ খুবই সুখী জীবন যাপন করছিল।

কখনো ইনকাম ট্যাক্স বেশী হয়ে গেছে, বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করো, অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করো, তাদের ঘুষ দাও, ব্লাকমার্কেট করো, উপার্জনকে যথার্থ করো, মিথ্যা রসিদ তৈরী করো, মোকদ্দমার তারিখ অনুযায়ী হাজির হও। বউ-এর আদেশ পালন করো, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করো। মজিদ এমনিতে খুব তাড়াতাড়ি ঝটপট কাজ করতো, বর্তমান জীবনের সাথে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল, তবু সে সুখী ছিল না। এ অসুখীপনা কাজের সময়ে সে অনুভব করতো না। অবসর সময় কাটানোর জন্যে বসে তিন-চার পেগ হুইস্কি খেলে এ অনুভূতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। অতীতের

স্মৃতিময় দিন তখন তার মনে মগজে জেঁকে বসতো। সেসব ভেবে সে মনে এক প্রকার শান্তি লাভ করতো। কিন্তু সব কথা মনে এলে সে অস্থিরতা অনুভব করতো। তবে এ অস্থিরতাও স্থায়ী হ'ত না, কারণ ব্যবসায়িক ঝামেলায় শিগগীরই জড়িয়ে পড়তো।

মজিদ যা কিছু অর্জন করেছিল সবই নিজের পরিশ্রমের দ্বারা করেছিল। বাড়ী, আসবাবপত্র, গাড়ী সবই নিজের শ্রমে করার কারণে তার একটা গর্ববোধ ছিল। সে কারো সাহায্য গ্রহণ করেনি, এ সান্ত্বনা ছিল বটে, কিন্তু চিন্তা এখন অনেক বেড়ে গেছে।

দশ-পনেরজন নারী তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। একজনের সাথে সাক্ষাৎ করলে অন্যজন অসন্তুষ্ট, নারাজ। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে। বউ-এর ভয় তো আছেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের চিন্তা লেগেই আছে। মোট কথা আজব ধরনের ঝামেলা। কিন্তু সেদিনও কেটে গেছে যখন মজিদ মাত্র ষাটটি টাকা অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করতো, অথচ চমৎকারভাবে দিন কেটে যেতো। রাতে ছারপোকা ভরা একটা বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতো। বেঞ্চিটা কতো বছর আগের, সেটা তার জানা ছিল না। দশ বছর আগে বেঞ্চিটির মালিক এক দোকানীর নিকট থেকে সে বেঞ্চিটি ক্রয় করেছিল। সে দোকানী তার ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার পর সেটি বিক্রয় করে। দোকানী আবার এগার বছর আগে এক কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ক্রয় করেছিল। অথচ সেই ছারপোকা ভরা বেঞ্চিতে শুয়ে মজিদ যে তৃপ্তি বোধ করতো, বর্তমানে জাঁকজমকপূর্ণ স্প্রিং-এর পালঙ্কে শুয়েও সে তৃপ্তি লাভ করছে না। এখন তাকে হাজার হাজার টাকার চিন্তা করতে হয়, অথচ তখন তাকে মাত্র দু'টাকার জন্য চিন্তা করতে হতো। তার কাছে তখন এক জোড়া বুটজুতো ছিল, প্রতি কাজের শেষে অফিসের বেঞ্চে ঘুমুতে গেলে জুতো জোড়াকে সে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করতো। সকালে উঠে হাম্মামে প্রাণভরে গোসল করতো, সেভ করতো, সামনের হোটেলে নাশতা খেয়ে এক কাপ চা, পাসিং-শোর একটা সিগারেট খেয়ে কাজ শুরু করতো। ভেণ্ডি বাজারে হাজীর হোটেলে সে দুপুরের খাবার খেতো। হোটেলটি ছিল খুবই ভালো। ঘিয়ে ভাজা ডাল, গোশত

খুবই মজাদার হতো। তারপর বরফের ঠাণ্ডা পানি, পাসিং শোর একটা সিগারেট খেলে তার দেহ-মন সজীব সতেজ হয়ে উঠতো। খাবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার কাজ শুরু করতো, সন্ধ্যা ছ'টায় কাজ শেষ করে এক আনা ব্যয় করে ট্রামে চড়ে সোজা এ্যাপোলো বন্দরে চলে যেতো। বাতাস, নানারকম লোক, রকমারী ভাষা, উঁচু উঁচু ইমারত, প্রশান্ত সমুদ্র, প্রবল ঢেউ, নৌকো, মোটরগাড়ী, সাইকেল, সুন্দরী নারী—গুজরাটী, মারাঠী যারা—দামী পোষাকে ফুল গুঁজে চলাফেরা করতো। পার্সিয়ান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান মেয়েরা সবাই তার নিকট দিয়ে চলে যেতো। ওদের দিকে তাকালে মজিদ মনে শান্তি লাভ করতো। কিন্তু ওদের দেখে মজিদের ইচ্ছে হতো না যে ওরা কেউ তার হোক। অথচ এখন স্ত্রী ছাড়াও দশ পনেরটি মেয়ের সাথে তার যৌন সম্পর্ক ছিল। তবুও সে প্রতিটি সুন্দরী মেয়ের প্রতি কামনাসুলভ দৃষ্টিতে তাকায়, ওদেরকে কাছে পাওয়ার উপায় চিন্তা করে।

এখনো সে ভ্রমণে বেরোয়, বাগানে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু এখন আর ফুল আগের মতো সুন্দর মনে হয় না। তার ফুলদানিতে অসংখ্য ফুল সাজানো থাকে, শুকিয়ে গেলে ফেলে দিয়ে নতুন ফুল সাজানো হয়। সে ফিরেও তাকায় না। তাকালেও কোন আকর্ষণ অনুভব করে না।

একদিন এ্যাপোলো বন্দরে যেতো, পরদিন যেতো চৌপাটিতে। ধূপছায়া বালুকায় সমুদ্রের দৃশ্য দেখতো। এ ছাড়া দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত সমুদ্রে জলতরঙ্গ খেলা করতো। মজিদ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো। পালতোলা সাদা নৌকো দেখতো। মন ভাল না লাগলে মালাবার হিলে চলে যেতো। হেঙ্গিং গার্ডেনস-এ গেলে মন জুড়িয়ে যেতো।

সে সময় মজিদের কোন শত্রু ছিল না। মনে হতো সারা পৃথিবী তার বন্ধু, তার স্বজন। উন্মুক্ত আকাশ তার বন্ধু—ট্রাম, সড়ক, ফুটপাত, ছারপোকা ভরা বেঞ্চি সবই তার বন্ধু। বেঞ্চিতে শোয়ার আগে সে ফুটপাতে ঘুমাতো। তখন মনে হতো সবকিছু তার একান্ত আপন।

কিন্তু এখন সবকিছুকে পর মনে হয়। অসংখ্য শত্রু ছড়িয়ে আছে। কাজকারবারে, প্রেমের ক্ষেত্রে, সর্বত্র সবখানে শত্রু ছড়িয়ে আছে। শত্রুমুক্ত কোনো জায়গা নেই।

সে জীবনও ছিল অদ্ভুত, আর এ জীবনও অদ্ভুত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ ও মাটির দূরত্বের মতোই পার্থক্য। তখন সে ছিল চিন্তাভাবনা মুক্ত, আর এখন সবসময় তাকে কোন না কোন চিন্তা করতে হয়। তখনকার ছোটখাট আনন্দও বহুদিন তার মনে থাকতো, তার মনকে সজীব সতেজ করে রাখতো। ছয় আনা দিয়ে এক মাইল ট্যাক্সীতে ভ্রমণ করলে বড় রকমের বিলাসিতা মনে হতো। ভিক্ষুককে একটা পয়সা দান করলে অপরিমেয় মানসিক শান্তি লাভ করতো, অথচ এখন অগণিত টাকা খয়রাত করেও সে-শান্তি পাওয়া যায় না। কারণ এ তো নিছক লোক-দেখানো।

সে সময়ে তার ছোট ছোট বিলাসিতাও খুবই আকর্ষণীয় হতো। নিজেকে খুশী করার জন্যে সে নিরিবিলি পদ্ধতি উদ্ভাবন করতো। বৈদ্যুতিক ট্রেনে চড়ে কোন গ্রামে গিয়ে তাড়ি খেয়ে আসতো। ঘুড়ি কিনে শিশুদের সাথে উড়াতে শুরু করতো। ষ্টেশনে গিয়ে স্কার্ট পরা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের নগ্ন উরুর দিকে তাকিয়ে থাকতো। এ দৃশ্য থেকে সে শিশুসুলভ আনন্দ লাভ করতো। কখনো দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে চলে যেতো। বাড়ী পৌঁছে এই ভেবে খুশী হতো যে সে এক বা দু'আনা পয়সা বাঁচিয়েছে। তারপর এ উদ্বৃত্ত পয়সা সে দৈনন্দিন কর্মতালিকা বহির্ভূত কোন কাজে ব্যয় করতো। কখনো কোন মেয়েকে প্রেমপত্র লিখে যে ঠিকানা মনে আসতো তাই লিখে ডাকাবাক্সে ফেলে দিত। আর এ বোকামীর উপর প্রাণ খুলে হাসতো। এক হাতের একটা আঙ্গুলে লম্বা নখ রাখতো, তারপর পরীক্ষা করার ছলে কোন দোকান থেকে কিছু রং মেখে নিত। এক একদিন শুধু পরের নিকট থেকে চেয়ে চেয়ে সিগারেট খেয়ে দুষ্টুমী ভরা আনন্দ অনুভব করতো। বেঞ্চিতে ছারপোকার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কোন কোনদিন সারারাত বাজারে ঘুরে বেড়াতো এবং বিরক্তির বদলে এক রকম মানসিক তৃপ্তি লাভ করতো। পকেটে পয়সা কম থাকলে দুপুর বেলা খাবার না

খেয়েও মনে করতো যে সে খেয়েছে।

এখন সে রকম অবস্থা ছিল না। অফিস থেকে যথেষ্ট টাকা আদায়ের উপায় রপ্ত করেছে। টাকার প্রাচুর্য শুরু হলে অতীতের সবকিছু ফিকে হয়ে এলো। তার ছোটখাট আনন্দের স্মৃতি সোনা-রূপার আড়ালে চাপা পড়ে গেল। এখন আনন্দের জন্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো, কিন্তু সেসব অনুষ্ঠান তাকে আনন্দ দিতে পারতো না। ষ্টেশনের সেতুর নীচে দাঁড়িয়ে থেকে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের নগ্ন উরু দেখে লাভ করা আনন্দ এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না। আগে একাকী রাত কাটাতো, অথচ এখন কোন না কোন মেয়ে তার পাশে ঘুমুতো, কিন্তু সে শান্তি তৃপ্তি উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন সে চিন্তায় অস্থির থাকে যে স্ত্রী দেখে না ফেলে, মেয়েটা গর্ভবতী না হয়ে পড়ে, সে নিজে সংক্রামক রোগের শিকার না হয়ে পড়ে, মেয়ের স্বামী না দেখে ফেলে। অথচ আগে এ জাতীয় কোন চিন্তার প্রশ্নই দেখা দিত না। এখন তার কাছে সবরকম মদ রয়েছে, কিন্তু আগে জাপানের তৈরী পানি মেশান বিয়ার পান করে যে আনন্দ লাভ করতো, এখন রকমারী মদেও সে তৃপ্তি ও আনন্দ খুঁজে পায় না।

অফিস থেকে বেরিয়ে এপোলো বন্দর এবং চৌপাটিতে ভ্রমণে বেরুনো ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। নানা দৃশ্য দেখে রাত আটটায় বাসায় ফিরতো। পথের পাশের পানির একটা কলে মুখ ধুয়ে বাইবেল সেতুর পাশের একটা বারে প্রবেশ করতো। বারে প্রবেশ করে কাউণ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে পার্সী শেঠ-এর সাথে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গুজরাটী ভাষায় কিছুক্ষণ আলাপ করতো। তারপর এক কোণে নির্দিষ্ট তার প্রিয় টেবিলের পাশে গিয়ে বসতো। একটু পরই বেয়ারার এসে টেবিল পরিষ্কার করে বলতো, বলুন শেঠ।

এ সম্বোধনে মজিদ নিজেকে সত্যি সত্যি শেঠ মনে করতো। পকেটে এক টাকা চার আনা পয়সা থাকলেও বেয়ারার-এর দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হেসে বলতো, প্রতিদিন তুমি আমাকে দেখো, অথচ তবুও জিজ্ঞেস করো, যাও, যা খাই, তাই নিয়ে এসো।

অভ্যাস মাফিক যাওয়ার আগে বেয়ারার ময়লা কাপড় দিয়ে

আবার টেবিল পরিষ্কার করে একটা গ্লাস রাখতো। তারপর একটা প্লেটে কাবুলী চানা, লবণাক্ত এক রকম ফল নিয়ে হাজির করতো। মজিদ বেয়ারারকে বলতো, তুমি পাঁপর ভাজা আনতে প্রতিদিনই ভুলে যাও।

বিয়ারের সাথে এ সবকিছু মজিদ বিনে পয়সায় খেতে পেতো। মজিদ আরো এক প্লেট কাবুলী চানা চেয়ে নিতো, বড় বড় চানা কালো কালো মরিচ দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগতো। সবকিছু মিলিয়ে মজিদের রাতের খাবার ভালভাবেই হয়ে যেতো।

বিয়ার এনে হাজির করলে ধীরে সুস্থে গ্লাসে ঢেলে আয়াসভরে গলাধঃকরণ করতো। শীতল বিয়ার গলায় ঢেলে সে বিস্ময়কর আনন্দ লাভ করতো। তার মনে হতো, সারা পৃথিবীর শীতলতা যেন তার মনে মগজে ছেয়ে আছে। মোটা পার্সী ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে মজিদ ভাবতো, লোকটার নাক এতো মোটা কেন, খোদা কোন অপরাধে ওদের নাকের প্রতি এমন অমনোযোগী হলেন? সেদিন ট্রামে এক পার্সী মহিলাকে দেখেও তার একই কথা মনে হয়েছিল। অথচ মহিলাটির রূপ, সৌন্দর্য অন্য কোন দিক দিয়েই কম ছিল না। বুক, ঠোঁট, গায়ের রং, ডাগর চোখ সবই ছিল আকর্ষণীয়। তাকে দেখে মজিদের দুঃখ হলো। সে ভাবলো, এমন কোন ব্যবস্থা কি নেই যাতে ওর নাকটি ঠিক করে দেয়া যায়? তারপর তার চোখের সামনে বিভিন্ন সময়ে দেখা সুন্দরী মেয়েদের চেহারা ভেসে উঠলো। মনে হলো যেন মেয়েদের যৌবন সে বিয়ারের সাথে মিশিয়ে পান করছে। দীর্ঘ সময় বসে বসে সে জীবনের সুন্দর ও মধুর সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করতো। একবার এপোলো বন্দরে দুরন্ত বাতাসে একটা ইহুদী মেয়ের রেশমী স্কার্ট উঠে গেলে সে তার সুন্দর উরু দেখে ফেলেছিল।

গত রবিবার ইরানী হোটেলে খাসীর পায়ের ঝোল কি যে ভাল লেগেছিল। রঙীন চলচ্চিত্রে সে সুন্দরী মেয়েদের নাচ দেখতো, গান শুনতো। সকালে নাশতার পর সিগারেট খেতে অদ্ভুত স্বাদ অনুভব করতো এবং ভাবতো যে এরূপ স্বাদ প্রতিদিনই সুখকর।

দারোয়া ষ্টেশনে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী দেখে মজিদ ভেবেছিল, ইস, ওরা কতো সুখী, যেন এক জোড়া কপোত-কপোতী। কেকি মিস্ত্রী খুবই ভাল মানুষ, আমি এ্যাসপ্রো চাইলে একদিন বিনে পয়সায় দিয়ে দিল। বললো, আপনার কাছে এটার কি আর দাম নেব? গত মাসে আপনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। পরে এক সময় পাঁচটা টাকা ধার চাইলে আমি সাথে সাথে দিয়ে দিলাম। সে টাকার জন্যে কখনো তাকে তাগাদা করিনি।

মজিদ আরো ভাবলো, সেদিন মাঠে একটা মারাঠী মেয়েকে আসন ছেড়ে দিলে মেয়েটি কি মিষ্টি মোলায়েম কণ্ঠে বলেছিল, থ্যাংক ইউ। এসব স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে মোটা পার্সী হোটেল ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে তার নাক দেখে মজিদ ভাবতো, ওর নাকের প্রতি এতো অবিচার করা হলো কেন? অথচ লোকটা কতো ভালো। এটা ভেবে নাকের কারণে বিরক্ত হলেও সে সে-ভাব গোপন করে রাখতো। পকেটে পয়সা না থাকলে কাউণ্টারে এসে শেঠকে বলতো, শেঠ, আজ মালপানি নেই, কাল দেব।

শেঠ হেসে বলতো, তাতে কোন অসুবিধে নেই। কাল আসবেন যেন।

চৌদ্দ আনায় বিয়ারের বোতল পাওয়া যেত। বোতল ও প্লেট খালি করে হাত ধুয়ে চমৎকার ইশারায় বেয়ারারকে ডেকে বিল আনতে বলতো। বেয়ারার বিল এনে হাজির করলে তার হাতে একটা টাকা দিয়ে নাটকীয় ভাবে বলতো, বাকী দু'আনা তুমি নিজের কাছে রেখে দাও।

বেয়ারার সালাম জানিয়ে সম্ভ্রম প্রকাশ করে এক পাশে চলে যেত। মজিদ আয়াস ভরে উঠে কাউণ্টারে গিয়ে শেঠকে 'চলি সাহেবজী' বলে বাসার পথে পা বাড়াতো। বাসার কাছে পৌঁছে তার পা ভারী হয়ে আসতো। তার বাসার কাছের একটা গলিতে ছোট একটা অন্ধকার কামরায় মিস নীনা থাকতো। এক সময়ে নামকরা নর্তকী ছিল। কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে গেছে। জাতে ইহুদী। তার দুটি মেয়ে আছে।—একটি আলথার অন্যটির নাম হেলেন। আলথার-এর বয়স ষোল, হেলেনের বয়স তের। উভয়ে দুটো লম্বা

জামা গায়ে দিয়ে মায়ের কাছাকাছি ঘুমুতো। ঘরে একটা মাত্র পালঙ্ক। মিস লীনা একটা চাটাই বিছিয়ে মেঝেতে ঘুমুতো।

রাতে বিয়ার খেয়ে মিস লীনার ঘরে যাওয়া মজিদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ভেতরে প্রবেশ করার আগে সে তিনটা চায়ের অর্ডার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতো এবং সশব্দে বলতো, আসসালামু আলায়কুম।—ভেতরে টিনের কুপি জলতো। আলথার ও হেলেন অর্ধোলঙ্গ হয়ে বসে থাকতো। মজিদের সালামের জবাবে —ওয়ালায়কুম সালাম—বলে জবাব দিত। লোহার চেয়ারে বসতে বসতে মজিদ বলতো, চায়ের অর্ডার দিয়ে এসেছি।

আলথার মিহিন কণ্ঠে বলতো, থ্যাংক ইউ!—মজিদ দু'বোনের অর্ধ নগ্ন বুক ও উরুর প্রতি তাকিয়ে মনে মনে তৃপ্তি লাভ করতো।

বাইরে থেকে চা এলে মা ও মেয়েরা খেতে শুরু করতো। মজিদ চুপচাপ বসে থাকতো। মজিদের মনে আনন্দের শিহরণ খেলে যেত। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তার মন চাইতো তিনজনকেই কৃতজ্ঞতা জানায়। ধোঁয়া ছড়ানো টিম টিম করে জলা প্রদীপের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানায়। লোহার আসনটি তাকে বসতে দিয়ে কৃতার্থ করায় সে তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইতো। কিছুক্ষণ যাবত মজিদ মা ও মেয়েদের কাছে বসে থাকতো। মেয়ে দুটি ছিল সুন্দরী। ওদের সৌন্দর্য মজিদের চোখে শান্তিকর ঘুম নিয়ে আসতো। বিদায় নেয়ার পর অফিসের বেঞ্চিতে শোয়ার অল্পক্ষণ পরই সে ঘুমিয়ে পড়তো।

অবসর সময়ে তিন-চার পেগ হুইস্কি খাওয়ার পর অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে মজিদ সবকিছু ভুলে যেতো। নেশা কমে এলে সে চোরাচালান সম্পর্কে ভাবতে শুরু করতো। টাকা উপার্জনের ফন্দি ফিকির নিয়ে ভাবতো। যেসব মেয়ের সাথে তার যৌন সম্পর্ক ছিল তাদের সম্পর্কে চিন্তা করতো।

যুদ্ধ-পূর্ববর্তী পরিবেশে মজিদের অতীত হারিয়ে গেছে। একটা অস্পষ্ট সীমারেখা বর্তমান রয়েছে—অর্থ সম্পদ দিয়ে মজিদ সে সীমারেখা মুছে দিতে চাচ্ছে।

●

দুই জাতি

মোখতার বাড়ীর দোতালার বাথরুমে থেকে প্রথম সারদাকে দেখেছিল। সুতাকাটা ঘুড়ি আনবার জন্যে সে উপরে গিয়েছিল। মুখোমুখি বাড়ীর জানালা খোলা। জানালার পাশের বাথরুমে একটা মেয়ে জগ হাতে গোসল করছে। মোখতার বিস্মিত হলো যে, এ এলো কোথা থেকে? কারণ সামনের বাড়ীতে কোন মেয়ে থাকতো না। যারা ছিল তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। মেয়েলোক বলতে ছিল শুধু রূপকোর। তার স্বামী কালু মল। তাদের তিনটা ছেলে আছে, আর কেউ নেই।

মোখতার ঘুড়ি হাতে নিয়ে বিস্মিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েটি সুন্দরী। তার নগ্ন দেহে সোনালী বাঁক সুস্পষ্ট। বিন্দু বিন্দু পানি দেহের ভাঁজে ভাঁজে চমকাচ্ছে। মেয়েটির গায়ের রং তামাটে, পানির ধারায় মনে হচ্ছে তার দেহ যেন গলে বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়বে।

মোখতার জানালার পাশে চোখ রেখে মেয়েটির প্রতি অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। মেয়েটির বয়স বড়জোর ষোল। উজ্জ্বল বুকে ছোট ছোট স্তন পানির ধারায় খুবই আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। মেয়েটিকে দেখে মোখতারের মনে কোন বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হলো না। একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে স্নান করছে। স্বাভাবিকভাবে মোখতারের মনে কামভাব জাগতে পারতো, কিন্তু সে নিষ্কাম আচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে রইলো, যেন কোন চিত্রকরের শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষ করছে।

মেয়েটির নীচের ঠোঁটের পাশে একটা বড় তিল, খুবই মনোরম, যেন নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন। এ তিল সারদার রূপ বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে, তিলটি এমনভাবে জেগে আছে যেন ওটি ওখানে না হলেই নয়। বাহুতে পানির ফোঁটা খুবই মোহন মনে হচ্ছে। মেয়েটির মাথার চুল সোনালী ও কালোর মাঝামাঝি। দেহের গঠন বিন্যাস খুবই সুশোভন, অথচ দেখে বাজে কোন ধারণাই মনে জাগে না।

মোখতার দীর্ঘক্ষণ সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকে।

মেয়েটি গায়ে সাবান মাখলো। মোখতার এতো দূরে দাঁড়িয়েও সে সাবানের সুগন্ধ পেলো। তামাটে রঙের দেহে সাবানের সাদাফেনা খুবই মোহনীয় দেখাচ্ছিল। সাবানের ফেনা পানির ধারায় বেয়ে পড়লে মোখতার অনুভব করলো, মেয়েটি যেন শান্তভাবে তার গায়ের শুভ্র পোষাক একপাশে খুলে রেখেছে।

গোসল শেষ করে মেয়েটি তোয়ালে দিয়ে গা মুছলো। ধীরে সুস্থে শান্তভাবে কাপড় পরিধান করলো। তারপর জানালার পাল্লায় হাত রেখে হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিল। মোখতার অকস্মাৎ হেসে ফেললো। মেয়েটি সাথে সাথে জানালা খুলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মোখতারের প্রতি তাকালো। মোখতার বললো, আমার কোন দোষ নেই, আপনি জানালা খুখে কেন গোসল করছেন?—মেয়েটি কোন কথা বললো না। ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল।

এ ঘটনার চতুর্থ দিনে রূপকোর মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে মোখতারদের বাড়ীতে এলো। মোখতারের মা ও বোন সেলাই-এর কাজে খুবই পারদর্শিনী। গলির বহু মেয়ে তাদের কাছে এ কাজ শিখ্‌তে আসে। রূপকোরও মেয়েটিকে এ উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে। নানা রকম সেলাই-এর কাজে মেয়েটির খুবই আগ্রহ। মোখতার বারান্দায় এসে রূপকোরকে প্রণাম করলো। মেয়েটির সাথে চোখাচোখি হতেই সে জড়সড় হয়ে গেল। মোখতার একটুখানি হেসে সেখান থেকে চলে গেল।

মেয়েটি সেদিনের পর প্রতিদিন আসতে শুরু করলো। মোখতারকে দেখলেই জড়সড় হয়ে যেত। ধীরে ধীরে তার মন থেকে এ ধারণা অনেকটা মুছে গেল যে, মোখতার তাকে গোসল করতে দেখেছে।

মোখতার জানতে পারলো যে মেয়েটির নাম সারদা। রূপকোরের চাচাতো বোন। পিতা-মাতা কেউ নেই। দূর সম্পর্কের এক দরিদ্র আত্মীয়ের কাছে থাকতো। রূপকোর তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে। মেট্রিক পাশ। খুবই মেধাবী। কুশিকাঁটার সেলাই-এর কাজ অনেক কষ্টে কিছুটা আয়ত্ত করেছিল।

দিন কাটতে লাগলো। এ সময়ে মোখতার অনুভব করলো যে, সে সারদার প্রেমে জড়িয়ে গেছে। এসব ধীরে ধীরে হলো। প্রথম দিনের দৃশ্য মোখতার কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সে দৃশ্যের পর থেকে ধীরে ধীরে সারদা তার মনের আসন অধিকার করে ফেলেছে। মোখতার কয়েকবার ভাবলো যে, এ ভালবাসা বোগাস ব্যাপার, কারণ সারদা হিন্দু। মুসলমান হয়ে সে একটা হিন্দু মেয়েকে ভালবাসার সাহস কিভাবে করতে পারে? মোখতার নিজেকে অনেক বোঝালো, কিন্তু ভালবাসার প্রেরণা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলো না। সারদা ইদানীং তার সাথে কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু তার আড়ষ্টভাব এখনো কেটে যায়নি। মোখতারকে দেখা মাত্রই তার মনে হতো যে, সে নগ্ন হয়ে স্নান করছে, আর মোখতার জানালার ওপাশ থেকে তার প্রতি তাকিয়ে আছে।

একদিন বাড়ীতে কেউ ছিল না। মোখতারের মা ও বোন এক আত্মীয়ের চেহ্‌লামে যোগদানের জন্যে গিয়েছিল। সারদা যথারীতি সকাল দশটায় একটা থলে নিয়ে এলো। মোখতার বারান্দায় একটা তক্তপোষে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। সারদা তাকে জিজ্ঞেস করলো, বোনজী কোথায়?

মোখতারের হাত কেঁপে উঠলো। বললো, ওরা বাইরে গেছেন।

সারদা জিজ্ঞেস করলো, মাতাজী?

মোখতার উঠে বসে পড়লো। বললো, তিনিও গেছেন।

'আচ্ছা' বলে সারদা ভয়ার্ত চোখে মোখতারের দিকে তাকালো এবং নমস্তে বলে চলতে শুরু করলো। মোখতার তাকে বাধা দিয়ে বললো, দাঁড়াও সারদা।

সারদার যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো। চমকে উঠে বললো, জী?

মোখতার দাঁড়িয়ে বললো, বসো, ওঁরা এক্ষুনি আসবেন।

জী না, আমি যাই।—এ কথা বলেও সারদা দাঁড়িয়ে রইলো।

মোখতার সাহসিকতার পরিচয় দিল। সামনে এগিয়ে সারদার একটা বাহু ধরে টেনে এনে তার ঠোঁটে চুমু খেলো। এ সবকিছু এতো

তাড়াতাড়ি হলো যে, মোখতার ও সারদা বুঝতেই পারলো না যে কি হয়েছে। তারপর উভয়ে কাঁপতে লাগলো। মোখতার কাঁপা গলায় শুধু বললো, আমাকে ক্ষমা করে দিও।

সারদা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। তার তামাটে রং লাল হয়ে গেল। ঠোঁটে মৃদু কম্পন দেখা দিল। যেন সে অভিযোগ করছে। মোখতার যা করেছিল সে কাজ এবং তার পরিণাম ভুলে গেল। সারদাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরলো। সারদা কোন প্রতিবাদ করলো না। সে যেন বিস্ময়ের প্রতিমূর্তি হয়ে রইলো। একটা মূর্তিমান প্রশ্ন হয়ে রইলো। নিজের কাছেই নিজের প্রশ্ন। যেন নিজেকেই সে জিজ্ঞেস করছে যে, এ কি হলো? এটা কি না হলেই চলতো না? এটা কি হতেই হতো? এরকম কি আর কারো সাথেও হয়ে থাকে?

মোখতার তক্তপোষের উপর বসে বললো, তুমি কোন কথা বলছ না কেন সারদা?

সারদা কোন জবাব দিল না। তার এ নীরবতায় মোখতার উদ্বিগ্ন হলো। বললো, সারদা, যদি আমার এ তৎপরতা তোমার ভাল না লেগে থাকে তবে বল, আমি অবশ্যই ক্ষমা চেয়ে নেব। তোমার প্রতি চোখ তুলে তাকাবো না। দেখ এ রকম কাজ অতীতে আমি কখনো করিনি। কিন্তু আজ আমার কি যে হলো, আসলে—আসলে আমি তোমাকে ভালবাসি।

সারদার ঠোঁট কেঁপে উঠলো। সে যেন ভালবাসা শব্দ উচ্চারণের চেষ্টা করলো। মোখতার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললো, আমি জানি না তুমি ভালবাসার অর্থ বুঝতে পারো কি না। এ সম্পর্কে আমি ভালভাবে অবহিত নই। তবে এটুকু জানি যে আমি তোমাকে চাই। তোমার সমগ্র অস্তিত্বকে আমি নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিতে চাই। তুমি যদি চাও তবে আমি নিজের সমগ্র জীবন তোমাকে উৎসর্গ করে দেব। সারদা তুমি কথা বলছ না কেন?

সারদার চোখে স্বপ্নাঞ্জন দেখা দিল। মোখতার আবার বলতে শুরু করলো, সেদিন আমি তোমাকে বাথরুমে দেখেছি। না আমি দেখিনি, তুমিই আমাকে দেখিয়েছ। সেদিনের সে দৃশ্য আজীবন আমি

ভুলতে পারবো না। তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমার দৃষ্টিতো তোমার সৌন্দর্য চুরি করেনি, আমার চোখে শুধু সে দৃশ্যের ছবি জেগে আছে। তুমি সে ছবিকে জীবিত করে দাও। আমি তোমার পদচুম্বন করবো। —এই বলে মোখতার সারদার একটা পায়ে চুমু খেল।

সারদা কেঁপে উঠলো। ঝট করে তক্তপোষের উপর থেকে উঠে কাঁপা গলায় সে বললো, এ আপনি কি করছেন, আমাদের ধর্মে—

মোখতার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বললো, ধর্মটর্ম ছাড়ো, প্রেমের ধর্মে সব ধর্ম ঠিক আছে। —এই বলে সে সারদাকে চুমু খেতে চাইলো। কিন্তু সারদা সুযোগ দিল না। ঝট করে এক পাশে সরে গিয়ে লজ্জিত ভাবে হেসে পালিয়ে গেল। মোখতারের নাচতে ইচ্ছে করলো। মোখতারের মা ও বোন ফিরে আসার পর সারদা আবার এলো। মোখতারকে দেখেই সে চোখ নীচু করে নিল। গোপনীয়তা ফাঁস হবার আশংকায় মোখতার কেটে পড়লো।

পরদিন উপরের কামরায় উঠে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো সারদা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। মোখতার তাকে ডেকে বললো, সারদা!

সারদা চমকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে চিরুণী ছুটে গিয়ে গলিতে পড়লো। মোখতার হাসলো। সারদার ঠোঁটেও হাসি ফুটে উঠলো। মোখতার বললো, কি ভীতু তুমি, দূরে থেকে ডাকলাম আর তোমার হাত থেকে চিরুণী পড়ে গেল।

সারদা বললো, এখন এনে দিন। নতুন চিরুণী। একেবারে নীচে গিয়ে পড়েছে।

মোখতার বললো, এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।

সারদা বললো, না না থাক, আমি তো রসিকতা করছিলাম।

মোখতার বললো, আমিও রসিকতা করেছি, তোমাকে ছেড়ে চিরুণী আনতে যাব? কিছুতেই না।

সারদা হেসে বললো, আমি চুল আঁচড়াব কি করে?

মোখতার জানালার ফাঁকে হাত প্রসারিত করে বললো, আমার এ আঙ্গুল নিয়ে নাও।

সারদা হাসলো, মোখতারের ইচ্ছে হলো সারাজীবন এ হাসির ছায়ায় কাটিয়ে দেয়। বললো, সত্যি বলছি সারদা, তোমার হাসি দেখে আমার দেহ-মন সজীব হয়ে উঠেছে। তুমি এতো প্রিয়তর, এতো মায়াবী কেন? পৃথিবীতে আর কোন মেয়েও কি তোমার মতো মায়াবী রয়েছে? এই দেয়াল এই দূরত্ব মন চায় মিটিয়ে দিই।

সারদা আবার হাসলো। মোখতার বললো, এ হাসি আর কেউ যেন দেখতে না পায়, এ হাসির শব্দ আর কেউ যেন শুনতে না পায়। শুধু আমার সামনেই হাসবে। আর কখনো যদি হাসতে হয় তবে আমাকে ডেকে নিও। আমি সে হাসির আশেপাশে ঠোঁটের দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেব।

সারদা বললো, আপনি কথা খুব ভালই বলতে পারেন।

মোখতার বললো, তবে আমাকে পুরস্কার দাও। ওখান থেকে ভালবাসার একটা হালকা দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করো। আমি তোমার পলক থেকে উঠিয়ে সে দৃষ্টি আমার চোখে লুকিয়ে রাখবো। মোখতার সারদার পেছন দিকে একটা ছায়ার মতো দেখে সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। কিছুক্ষণ পর এসে দেখে জানালায় কেউ নেই। সারদা চলে গেছে।

ধীরে ধীরে মোখতার ও সারদা উভয়ে দুধ-চিনির মতো মিশে গেল। সময় পেলেই নিরিবিলি উভয়ে প্রেমালাপ করতো। একদিন রূপকোর ও তার স্বামী লালা কালুমল কোথায় যেন বাইরে গিয়েছিল। মোখতার গলিপথে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার গায়ে একটা ঢিল এসে পড়লো। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে সারদা হাতের ইশারায় তাকে ডাকছে।

মোখতার তার কাছে গেল। নিরিবিলি পরিবেশ পেয়ে উভয়ে মনের কথা বললো। মোখতার বললো, সেদিন আমি গোস্তাখী করেছিলাম, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আজ আবার গোস্তাখী করার ইচ্ছে করছি। তবে আজ ক্ষমা চাইব না।—এই বলে সারদার কম্পিত ঠোঁটে সে নিজের ঠোঁট মিশিয়ে দিল।

সারদা লজ্জিত দুষ্টামীর ভঙ্গীতে বললো, এবার ক্ষমা চেয়ে নিন।

মোখতার বললো, জী না, এখন আর এ ঠোঁট আপনার নয়,

আমার। আমি কি মিথ্যে বলছি?

সারদা মাথা নীচু করে বললো, এ ঠোঁট তেমন কি আমিই আপনার।

মোখতার দৃঢ়ভাবে বললো, দেখ সারদা, আমরা এখন একটা অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছি। তুমি ভেবে দেখ, চিন্তা করে দেখ। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, শপথ করে বলছি, তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কোন নারী আসবে না। সারাজীবন আমি তোমারই থাকবো। আমার প্রেম সুদৃঢ় থাকবে। তুমিও কি এ প্রতিজ্ঞা করছ?

সারদা চোখ তুলে মোখতারের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার প্রেম সত্য।

মোখতার সারদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, বেঁচে থাক। শুধু আমারই জন্যে, আমার প্রেমের জন্যেই উৎসর্গিত হও। সারদা তোমার ভালবাসা না পেলে নিঃসন্দেহে আমি আত্মহত্যা করতাম। তুমি আমার পাশে থাকলে মনে হয় সারা পৃথিবীর আনন্দে আমার ঝুলি পূর্ণ হয়ে আছে। আমি খুবই ভাগ্যবান।

সারদা মোখতারের কাঁধে নিজের মাথা রেখে বললো, আপনি খুবই সুন্দর কথা কথা বলতে জানেন। আমি মনের কথা প্রকাশ করতে পারি না।

দীর্ঘক্ষণ একে অন্যের মধ্যে ডুবে থাকলো। মোখতার বিদায় নিয়ে গেলে সারদার মনে হলো তার প্রাণ এক নয়া আনন্দে তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সারারাত সে ভাবনার মধ্যে কাটালো। পরদিন মোখতার কোলকাতা গেল। সেখানে তার পিতা ব্যবসা করেন। আটদিন পর ফিরে এলো। সারদা যথারীতি কুশিকাঁটায় সেলাইর কাজ শেখার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে আসতো। মোখতারের সাথে দেখা হবার পর তাদের মধ্যে চোখে চোখে কথা হলো। সারদার চোখে জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে আছে, কোথায় গায়েব ছিলে এতদিন? আমাকে কিছু না বলেই কোলকাতা চলে গেলে? ভালবাসার বড় বড় বুলি আওড়াও! আমি তোমার সাথে কথা বলবো না। আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? কি চাও আমার কাছে?

মোখতার অনেক কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু নিরিবিলি সুযোগ

পেল না। সারদার সাথে সে দীর্ঘ আলাপ করতে চাইলো। দু'দিন কেটে গেলেও সে সুযোগ এলো না। চোখে চোখে অব্যক্ত কথা হলো। তৃতীয় দিন সারদা তাকে ডেকে পাঠালো। মোখতার খুব খুশী হলো। রূপকোর ও তার স্বামী কালুমল বাড়ীতে ছিল না।

উপরে ওঠার সময়ে সিঁড়িতেই সারদার সাথে দেখা হলো। মোখতার সেখানেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাইলো। কিন্তু সারদা চঞ্চল হরিণীর মতো লাফিয়ে উপরে চলে গেল। মোখতার তাকে বললো, দেখো প্রাণ আমার, আমার কাছে বসো, আমি তোমার সাথে খুবই জরুরী কথা বলতে চাই। এমন কথা যার সাথে আমাদের জীবনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

সারদা পালঙ্কের উপর মোখতারের পাশে বসলো। বসে বললো, মিথ্যা কথা বলো না, সত্যি করে বল আমাকে—না বলে কোলকাতা গেলে কেন ?

মোখতার সারদার চোখে চুমু খেলো। বললো, সেদিন তোমার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পর আমি সারারাত ভেবেছি। সেদিন যা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে চিন্তা-ভাবনা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের অবস্থা ছিল স্বামী-স্ত্রীর মতো। আমি ভুল করেছি। অথচ তুমি কিছুই ভেবে দেখনি। আমি পরপর কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করেছি, অথচ চিন্তাও করিনি যে, যাচ্ছি কোথায়। বুঝতে পারছো সারদা ?

সারদা মাথা নীচু করে বললো, জী হ্যাঁ।

মোখতার বললো, আমি আব্বাকে রাজী করানোর জন্য কোলকাতা গিয়েছিলাম। তুমি শুনে খুশী হবে যে আমি তাকে রাজী করিয়ে নিয়েছি। মোখতারের চোখে-মুখে খুশীর ঝিলিক। সারদার দু'হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে সে বললো, আমার মনের সব বোঝা হালকা হয়ে গেছে। এবার আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি।

সারদা যেন চমকে উঠলো। বললো, বিয়ে ?

মোখতার বললো, হ্যাঁ, বিয়ে।

সারদা জিজ্ঞেস করলো, কিভাবে হতে পারে আমাদের বিয়ে ?

মোখতার হেসে বললো, অসুবিধে কি, তুমি মুসলমান হয়ে যাবে।

সারদা চমকিত কণ্ঠে বললো, মুসলমান?

মোখতার শান্তকণ্ঠে বললো, হাঁ হাঁ, এ ছাড়া আর কিইবা হতে পারে। আমি জানি, তোমার আত্মীয়-স্বজন এতে খুবই গোলমাল করবে, কিন্তু আমি সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমরা উভয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাব। সোজা কোলকাতায় গিয়ে উঠব। বাকি কাজ আব্বাজী করবেন। যেদিন আমরা ওখানে পৌঁছবো সেদিনই মওলানা ডেকে তোমাকে মুসলমান করে নেবেন। সাথে সাথে আমাদের বিয়েও হবে।

সারদার ঠোঁট কে যেন সেলাই করে দিয়েছে। সে কোন কথা বললো না। মোখতার বললো, কথা বলছ না যে!

সারদা কথা বললো না। মোখতার অস্থির হয়ে উঠলো। বললো, কি হয়েছে সারদা বল।

সারদা কোন রকমে বললো, তুমি হিন্দু হয়ে যাও।

মোখতার বিস্মিত স্বরে বললো, আমি হিন্দু হয়ে যাব? তারপর হেসে বললো, আমি হিন্দু হবো কিভাবে?

সারদা বললো, আমি মুসলমান হবো কিভাবে?

মোখতার বললো, তুমি কেন মুসলমান হতে পারবে না? আমি বলতে চাই যে, তুমি আমাকে ভালবাসো। এ ছাড়া ইসলাম সবচেয়ে ভাল ধর্ম। হিন্দু ধর্মও একটা ধর্ম—গাভীর প্রস্রাব পান করে—মূর্তি পূজা করে! আমি বলতে চাই যে তবু সে ধর্ম তার স্থানে থাকুক। কিন্তু ইসলামের মুকাবিলা তা কিছুতেই করতে পারে না। তুমি মুসলমান হয়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সারদার তামাটে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললো, আপনি হিন্দু হবেন না? মোখতার হেসে বললো, তুমি পাগল হয়েছ?

সারদা ফ্যাকাশে চেহারায় বিরস কণ্ঠে বললো, আপনি চলে যান—ওরা এসে পড়বে। এই বলে সে পালঙ্ক থেকে উঠে গেল।

মোখতার বিস্মিত হয়ে বললো, কিন্তু সারদা—

সারদা শীতল কণ্ঠে বললো, না না, আপনি যান, তাড়াতাড়ি যান। ওরা এসে পড়বে।

মোখতার শুষ্ককণ্ঠে বললো, আমরা একে অন্যকে ভালবাসি। তুমি নারাজ হয়ে গেলে কেন সারদা?

সারদা ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বললো, যাও, চলে যাও। আমাদের ধর্ম খুবই খারাপ—তোমরা মুসলমান খুবই ভালো। এই বলে সে অন্য কামরায় চলে গেল এবং দরজা বন্ধ করে দিল।

মোখতার ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে এলো।

◆

খালেদ মিয়া

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে মমতাজ অভ্যাস মাফিক তিন কামরায়ই ঝাড়ু দিল। এদিক ওদিক থেকে সিগারেটের টুকরো দিয়াশলাই-এর পোড়া কাঠি বের করলো। তিনটি কামরাই ভালভাবে ঝাড়ু দিয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

মমতাজের স্ত্রী শিশুকে নিয়ে তখনো ঘুমিয়ে আছে। প্রতিদিন সকালে উঠেই সর্বাগ্রে নিজের তিন কামরায় ঝাড়ু দেয়ার কারণ হলো তার পুত্র খালেদ এখন চলাফেরা করতে পারে। অন্য সব শিশুদের মতো সেও সামনে যা পেতো তাই মুখে দিত। মমতাজ কামরায় ভালভাবে ঝাড়ু দিলেও সে বিস্মিত হতো যে শিশু কিছু না কিছু তার ছোট হাত দিয়ে খুঁজে নিয়ে মুখে দিত। ঘরের মেঝের প্লাষ্টার এখানে সেখানে খসে গেছে, এজন্যে কিছু কিছু খড়কুটো আটকে থাকতো। এক বছরের শিশু সেখান থেকে কিছু একটা মুখে দিতে কসুর করতো না। কিন্তু এতো যত্ন সহকারে পরিষ্কার করার পরও শিশুকে কিছু তুলে মুখে দিতে দেখলে তার নিজেকেই অপরাধী মনে হতো। খালেদের প্রতি তার শুধু স্নেহ-মমতাই নয় রীতিমতো প্রেম ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, শিশুর প্রথম জন্ম-বার্ষিকী যতোই ঘনিয়ে আসছিল, ততোই মমতাজের কেন যেন মনে হতে লাগলো যে, এ শিশু এক বছর পুরো হবার আগেই মরে যাবে।

নিজের এ ভয়াবহ ধারণার কথা স্ত্রীর কাছেও সে ব্যক্ত করলো। সবাই জানতো যে মমতাজ খেয়ালী লোক নয়। তার স্ত্রী স্বামীর এ ধরনের উদ্ভট মনোভাব শুনে বললো, কি সব বাজে ধারণা করছেন! আল্লাহ চাহে তো আমাদের সন্তান একশ' বছর বেঁচে থাকবে। আমি তার প্রথম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে এমন আয়োজন করবো যে, আপনি অবাক হবেন।

এ কথা শুনে মমতাজের মনে কেমন যেন খটকা লাগলো। সে কবে

চাইতো যে তার পুত্র বেঁচে না থাকুক! কিন্তু তার খেয়ালের কি চিকিৎসা হতে পারে? খালেদ সুস্থ সবল শিশু। শীতের সময়ে তাদের চাকর শিশুকে বাইরে ভ্রমণ করিয়ে এনে মমতাজের স্ত্রীকে বললো, বেগম সাহেবা, আপনি খালেদ মিয়ার গালে রং লাগাবেন না, কারোর চোখ লেগে যাবে।

এ কথা শুনে মমতাজের স্ত্রী খুব করে হাসলো। বললো, বোকা, ওর গালে রং লাগানোর কি দরকার আমার। খোদার রহমে তার গাল এমনিতেই লাল।

শীতের সময়ে খালেদের গাল খুবই লাল ছিল। গ্রীষ্মকাল এলে কিছুটা ফ্যাকাশে মনে হলো। শিশুর পানির প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। এজন্যে হাই তুলে ঘুম থেকে ওঠার পর বোতলের দুধ খেলে অফিসে যাওয়ার আগে মমতাজ তাকে পানির বালতিতে দাঁড় করিয়ে দিতো। দীর্ঘক্ষণ শিশু পানিতে খেলা করতো। মমতাজ ও তার স্ত্রী শিশুর প্রতি তাকিয়ে হাসতো। কিন্তু মমতাজের আনন্দে কেমন একটা বেদনার ছায়াপাত থাকতো। সে ভাবতো, খোদা যেন আমার স্ত্রীর আশাই পূরণ করেন। তার কথাই যেন সত্যি হয়। নিজের মনে শিশুর মৃত্যুর খটকার কোন কারণ সে খুঁজে পেত না।

সে ভাবতো, শিশু মারা যাবে কেন, সুস্থ সবল, সমবয়েসীদের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যবান। আমি পাগল হয়ে যাব। তার প্রতি আমার মাত্রাছাড়া ভালবাসার কারণেই এ ধারণা হচ্ছে। কিন্তু ওর প্রতি আমার এতো ভালবাসা কেন? সব পিতারাই কি শিশুকে এ রকম ভালবাসে? সব পিতার মনেই কি শিশুর মৃত্যুর এ রকম আশংকা জাগে? আমার হয়েছেটা কি?

তিনটি কামরা ভালভাবে ঝাড়ু দিয়ে মেঝেতে চাটাই পেতে শুয়ে পড়লো। এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। গরমের দিনে ঘুম থেকে উঠে ঝাড়ু দিয়ে আধঘণ্টা সে বালিশ ছাড়া ঘুমিয়ে কাটায়। এতেই সে তৃপ্তিলাভ করে।

সেদিন এভাবে শুয়ে শুয়ে সে ভাবছিল, পরশু আমার শিশুর প্রথম জন্মদিন। যদি এ দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে যায় তাহলে আমার

মনের সকল ভার হালকা হয়ে যাবে। আমার এ খেয়ালীপনাও দূর হবে। তারপর বললো, হে খোদা, সবই তোমার ইচ্ছা।

চোখ বন্ধ করে মমতাজ এসব ভাবছে। হঠাৎ নগ্ন গায়ের উপর বোঝার মতো অনুভব হওয়ায় তাকিয়ে দেখে খালেদ। স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রী বললো, সারারাত অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছি, মাঝে মাঝে ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠছিলাম।

মমতাজের বুক কেঁপে উঠলো। খালেদের গায়ে হাত রেখে মমতাজ বললো, খোদা আমার সন্তানের হেফাজত করো।

মমতাজের স্ত্রী বললো, তওবা, এ আপনি কি বলছেন, আপনাকে খেয়ালীপনা ঘিরে রেখেছে।—এই বলে মমতাজের স্ত্রী কামরা থেকে বাইরে চলে গেল। মমতাজ তার বুকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা খালেদের পিঠ চাপড়াতে লাগলো। তার বুক অজানা আশংকায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়া শিশু জেগে উঠলো। পিতার দিকে তাকিয়ে সে হেসে ফেললো। মমতাজ শিশুর মুখে চুমু খেয়ে বললো, কি ব্যাপার মিয়া খালেদ, আপনি কাঁপছিলেন কেন?

খালেদ হেসে পিতার বুকে মাথা রাখলো। মমতাজ পুনরায় তার পিঠ চাপড়াতে শুরু করলো। মনে মনে সে পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করলো।

মমতাজের স্ত্রী পুত্রের প্রথম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন করেছিল, সব বান্ধবীকে বিশেষ ভাবে দাওয়াত করলো। দর্জির নিকট জন্মদিনের পোষাক তৈরী করলো। অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের আয়োজন করলো। মমতাজ এতো আড়ম্বর পছন্দ করতো না। সে চাচ্ছিল যে সবার অজ্ঞাতেই তার সন্তানের প্রথম জন্মদিন কেটে যাক। এক বছর কেটে আরো কিছুদিন কেটে যাবার পরই সবাই জানুক—এটাই সে চাইতো।

খালেদ পিতার বুকের উপর থেকে উঠলো। মমতাজ তাকে প্রীতি-ভরা কণ্ঠে বললো, খালেদ আব্বাকে সালাম করবে না?

খালেদ হেসে মাথার কাছে হাত তুললো। মমতাজ তাকে আশীর্বাদ করলো। বললো, বেঁচে থাক। কিন্তু এ কথা বলার পরই অজ্ঞাত

আশংকা ও বেদনার রাজ্যে নিমগ্ন হলো।

খালেদ পিতাকে সালাম জানিয়ে বাইরে চলে গেল। অফিসে যাওয়ার তখনো সময় হয়নি। মমতাজ শুয়ে শুয়ে চিন্তামুক্ত হবার চেষ্টা করলো। এমন সময় বাইরে থেকে তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মমতাজ সাহেব, মমতাজ সাহেব, এদিকে আসুন।

স্ত্রী-কণ্ঠে ভয়ের প্রকাশে মমতাজ চমকে উঠলো। দ্রুত বাইরে গিয়ে দেখলো স্ত্রী গোসলখানার বাইরে শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিশু কোলে ছটফট করছে। মমতাজ পুত্রকে কোলে নিয়ে স্ত্রীর কাছে শিশুর কম্পিত হবার কারণ জিজ্ঞেস করলো।

স্ত্রী ভয়ার্তস্বরে বললো, জানি না, পানিতে খেলছিল। আমি পাক সাফ করছিলাম। হঠাৎ এ অবস্থা।

মমতাজের কোলে খালেদ এমনভাবে ছটফট করছে যেন কেউ তাকে ভিজা কাপড়ের মতো চিপিয়ে পানি ঝরাচ্ছে। সামনের তক্তপোষে মমতাজ শিশুকে শুইয়ে দিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভীষণ উদ্বিগ্ন। কি করবে তারা কিছুই ভেবে পেল না। নানাভাবে শিশুকে শান্ত করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু শিশু শান্ত হলো না। কিছুক্ষণ পর শিশুর ছটফট করা অবস্থা কেটে গেল এবং সে অসাড় হয়ে পড়ে রইলো। মমতাজ মনে করলো যে শিশু মরে গেছে। এজন্যে বললো, শেষ হয়ে গেছে।

মমতাজের স্ত্রী চীৎকার করে বললো, লাহাওলা, ওয়ালা কুয়াতা—কি যা তা বলছেন—কাঁপুনি উঠেছিল, কেটে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

হঠাৎ খালেদ ক্লান্ত চোখে পিতার প্রতি তাকালো। মমতাজের ধরে যেন প্রাণ ফিরে এলো। মমতাভরা কণ্ঠে সে পুত্রকে আদর জানিয়ে বললো, কি মিয়া খালেদ, আপনার কি হয়েছিল?

খালেদ হেসে ফেললো। মমতাজ তাকে কোলে তুলে ঘরের ভেতর চলে গেল। বিছানায় শোয়াতে যাবে এমন সময় আবার কাঁপুনি উঠলো। যেন জবাই করা মুরগী। মমতাজের মনে হলো, খালেদ নয়, সেই যেন কষ্ট পাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর এ অবস্থা কেটে

গেলে খালেদকে আরো বেশী ক্লান্ত দেখালো। মমতাজ তাকে বললো, মিয়া খালেদ, আপনার কি হয়েছে, এমন করছেন কেন? উঠুন, উঠে হাঁটুন। খালেদ মিয়া মাখন খাবেন?—মাখন খালেদের খুবই প্রিয়। কিন্তু সে মাথা নেড়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করলো। মমতাজ পুত্রকে কোলে তুলে আদর জানিয়ে স্ত্রীর কাছে দিয়ে বললো, এর দিকে খেয়াল রেখো, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

মমতাজের চলে যাওয়ার পর আরো তিনবার একই অবস্থা হলো। মমতাজের স্ত্রী কি করবে ভেবে পেল না। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললো, ভয়ের কারণ নেই। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি। ঠিক হয়ে যাবে। জর বেশী নেই। আপনারা চিন্তা করবেন না।

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে মমতাজ সারাদিন পুত্রের শিয়রে বসে কাটালো। ডাক্তার যাওয়ার পর আরো দু'বার কাঁপুনি উঠলো। বিকেলের দিকে অনড় হয়ে সে শুয়ে রইলো। মমতাজ ভাবলো, খোদার রহমতে ভালো হয়ে গেছে মনে হয়। তারপর কামনা করলো যে, খোদা রাতটা যেন ভালোয় ভালোয় কাটে।

মমতাজের স্ত্রীও খুশী হলো। বললো, খোদা চাহে তো খালেদ কাল হাসবে, খেলা করবে।

রাতে নির্দিষ্ট সময়ে শিশুকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। এজন্যে ঘুমিয়ে পড়ার আশংকায় মমতাজ শয্যায় শয়ন করলো না। আরাম কেদারায় বসে সারারাত জেগে কাটালো। মাঝে মাঝেই খালেদ কেঁপে কেঁপে জেগে উঠছিল, জরও প্রবল।

সকাল সাতটার দিকে মমতাজ থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো খালেদের গায়ে একশো চার ডিগ্রী জর। ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার বললো, আশংকার কারণ নেই, ব্রংকাইটিস হয়েছে। আমি ব্যবস্থা লিখে দিচ্ছি। ওষুধ নিয়ে আসুন। তিন-চার দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যাবে।

ডাক্তার ওষুধের ব্যবস্থা লিখে দিয়ে চলে গেল। মমতাজ ওষুধ এনে শিশুকে এক দাগ খাওয়ালো। কিন্তু কিছু হলো না। দশটার দিকে বড় এক ডাক্তার ডেকে আনলো। সে ডাক্তার ভালভাবে পরীক্ষা

করে বললো, ভয়ের কোন কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ঠিক হলো না। বড় ডাক্তারের দেয়া ওষুধেও কোন কাজ হলো না। জ্বর বেড়ে চললো।

মমতাজের চাকর বললো, সাহেব, অসুখ-টসুখ কিছু নয়, খালেদের বদ-নজর লেগেছে, আমি একটা তাবিজ লিখিয়ে এনে দিচ্ছি। আল্লাহ চাহে তো তাতে ভাল হয়ে যাবে।

চাকরের কথা অনুযায়ী সাত কুঁয়োর পানি একত্র করে সে পানিতে তাবিজ ধুয়ে খাওয়ানো হলো। কিন্তু কোন লাভ হলো না। একজন প্রতিবেশী এসে একটা ওষুধের কথা বললো। বিকেলে মমতাজের এক আত্মীয় একজন ডাক্তার নিয়ে এলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললো, ম্যালেরিয়া হয়েছে, এ রকম জ্বরে ম্যালেরিয়াই হয়ে থাকে। আপনি ওকে বরফের পানি দিন। আমি কুইনিনের ইনজেকশন দিচ্ছি।

বরফের পানি দেয়া হলে জ্বর একেবারে কমে গেল। তাপমাত্রা আটানব্বই ডিগ্রীতে নেমে এলো। মমতাজ ও তার স্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার তাপমাত্রা বেড়ে গেল। মমতাজ থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখলো যে তাপমাত্রা একশ' দশ ডিগ্রীতে পোঁচেছে।

প্রতিবেশীরা এলো। তারা হতাশ চোখে শিশুর প্রতি তাকালো। মমতাজ ও তার স্ত্রী নিরুপায় হয়ে গেল। নীচে কারখানায় ফোন ছিল। হাসপাতালে ফোন করলে তারা বললো, শিশুকে নিয়ে আসুন। মমতাজ টাঙ্গা ডাকিয়ে এনে স্ত্রীর কোলে খালেদকে বসিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। মমতাজ সারাদিন অস্বাভাবিক পরিমাণ পানি খেলো। কিন্তু কিছুতেই পিপাসার নিবৃত্তি হচ্ছিল না। ভাবলো টাঙ্গা থেকে নেমে কোন দোকানে এক গ্লাস পানি খেয়ে আসবে। কিন্তু খোদাই জানে, কোথা থেকে তার মনে এ খেয়াল এলো যে, দেখো, যদি পানি পান করো তাহলে তোমার খালেদ বাঁচবে না।

মমতাজের গলা বিশ্রীভাবে শুকিয়ে গেলো, তবু সে পানি পান করলো না। টাঙ্গা হাসপাতালের কাছে পৌঁছালে সে সিগারেট ধরালো। দু'টান দিয়েই সিগারেট ফেলে দিল। তার মাথায় এ ধারণা

এলো যে, সিগারেট খেও না, শিশু মরে যাবে। মমতাজ টাঙ্গা থামালো। ভাবলো কি সব আজে-বাজে চিন্তা, সিগারেট খেলে শিশুর ক্ষতি হবে কেন? এই ভেবে রাস্তার পাশের দোকান থেকে সিগারেট কিনে টাঙ্গায় উঠে এলো। কিন্তু সিগারেট টানতে যাবে এমন সময় এক অজানা শক্তি তাকে ফিরিয়ে রেখে যেন বললো, না, মমতাজ অমন করো না, খালেদ মরে যাবে।

মমতাজ সিগারেট জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। টাঙ্গাওয়ালা তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো—মমতাজ অনুভব করলো। যেন তার মস্তিষ্কের অবস্থা জেনে লোকটা তার সাথে বিদ্রূপ করছে। নিজের কুপিতভাব দূর করার জন্যে মমতাজ টাঙ্গাওয়ালাকে বললো, সিগারেটটা নষ্ট হয়ে গেছে।—এই বলে সে পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করলো। কিন্তু অগ্নি সংযোগ করতে গিয়ে ভয় পেলো। তার মনে তোলপাড় হচ্ছে—এক অজানা শক্তি যেন তাকে জড়িয়ে ফিরছে।

হাসপাতালের গেটে গিয়ে আঙ্গুলে সিগারেট পিষে ফেলে দিলো। নিজের প্রতি এই ভেবে তার করুণা হলো যে, খেয়ালীপনার কি নির্মম শিকার সে হয়েছে।

হাসপাতালের ডাক্তাররা খালেদকে ভর্তি করলো। পরীক্ষা করে বললো, ব্রংকো-নেমোনিয়া। অবস্থা আশংকাজনক।

খালেদ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে। তার মা তার প্রতি উদাস চোখে তাকিয়ে। হাসপাতাল সংলগ্ন বাথরুমে প্রবেশ করে মমতাজ পানি খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে চাইলো। হঠাৎ তাকে কে যেন বললো, মমতাজ, এ তুমি কি করছ, পানি খেয়ো না, তোমার খালেদ মরে যাবে!

মমতাজ মনে মনে নিজেকে গালি দিল এবং প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে পেট পুড়ে পানি খেল। বাইরে এসে দেখলো যে, খালেদ আগের চেয়ে আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার ইচ্ছে হলো কোথাও পালিয়ে যায়, কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। মনে মনে কামনা করলো খালেদ ভাল হয়ে যাক, তার বদলে আমার নিমোনিয়া হোক।

খালেদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। মমতাজ ভাবলো, তার

পানি পান করার কারণেই এরূপ হলো। পানি পান না করলে খালেদের অবস্থা ভালো হয়ে যেতো। নিজেকে সে তিরস্কার করলো, শাসন করলো। এসব চিন্তার সময়ে তার মনে হলো, এগুলো তার নয় অন্য কারো চিন্তা, অন্য কারো উক্তি। কিন্তু কে সে? কেন তার মনে মগজে এসব খেয়ালীপনার জন্ম হচ্ছে? পিপাসায় পানি পান করেছে। এতে খালেদের উপর কেন প্রভাব পড়বে? খালেদ ভালো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। পরশু ওর জন্মদিন। খোদা চাহেন তো ভালভাবেই দিনটি পালন করা হবে।

কিন্তু হঠাৎ তার মন বলে উঠলো, না এক বছর হতে পারবে না, তার আগেই খালেদ মরে যাবে। মমতাজের ইচ্ছে হলো এসব খেয়ালীপনা যার কারণে জাগ্রত হচ্ছে তাকে টেনে বের করে দেয়। কিন্তু খেয়ালীপনার শব্দ তো তার মন থেকেই আসছে। খোদাই জানেন, এসব কেন হচ্ছে, কোথেকে হচ্ছে?

উদ্বিগ্ন মমতাজ গদগদ স্বরে খেয়ালীপনাকে লক্ষ্য করে বললো, আল্লার ওয়াস্তে, আমার প্রতি সদয় হও। কেন আমার পিছনে লেগেছ?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কয়েকজন ডাক্তার খালেদকে দেখেছে। কয়েকটা ইনজেকশন দিয়েছে। মুখে ওষুধ ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু খালেদের তখনো সংজ্ঞাহীন অবস্থা কাটেনি। হঠাৎ মমতাজের মনে এ ভাব উদয় হলো যে, তুমি এখান থেকে চলে যাও, না হলে খালেদ মরে যাবে।

মমতাজ প্রথমে কামরার বাইরে, তারপর হাসপাতালের বাইরে চলে গেল। মমতাজ অস্পষ্ট শব্দাবলীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করলো। সে শব্দ তাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। সে শব্দ তাকে মদ খেতে বললো। মদ সামনে আনলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বললো। মমতাজ মদের গ্লাস ছুঁড়ে ফেললো। আর এক গ্লাস আনতে বললো। দ্বিতীয় গ্লাস আনলে সেটিও ছুঁড়ে ফেললো। তারপর ভাঙ্গা গ্লাস ও মদের দাম মিটিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো। তার মনে হলো চারদিকে নীরবতা ছেয়ে আছে, শুধু তার মগজ জেগে আছে। হাঁটতে হাঁটতে আবার হাসপাতালে পৌঁছালো। খালেদের কামরার দিকে পা বাড়ালে তাকে বলা হলো, ওদিকে যেও না, তোমার খালেদ মরে যাবে।

মমতাজ ফিরে এলো। সামনের খোলা মাঠের এক পাশে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে পড়লো। রাত দশটা বেজে গেছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রচ্ছন্ন নীরবতা। মাঝে মাঝে মোটরের হর্ণ সে নীরবতা খান খান করে দিচ্ছে। সামনের উঁচু দেয়ালে হাসপাতালের উজ্জল ঘড়ি টাঙ্গানো। মমতাজ খালেদের কথা ভাবছে। ও কি বাঁচবে? যে শিশু মরে যাবে তার জন্মই বা হয় কেন? খালেদ ওঠো—কে যেন বললো—তুমি নত হয়ে যাও, সেজদায় পড়ে থাকো। খালেদ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সেজদায় পড়ে থাকো। খালেদ তাই করলো। দোয়া করতে চাইলো, কিন্তু আদেশ পেলো না। মমতাজের চোখে অশ্রু উছলে উঠলো। খালেদের জন্যে নয়, সে নিজের জন্যে দোয়া করলো, খোদা আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও। যদি তুমি খালেদকে মেরে ফেলতে চাও তবে মেরে ফেলো, কিন্তু আমার এ অবস্থা হচ্ছে কেন?

হঠাৎ অদূরে কথাবার্তা শোনা গেল। মমতাজ তাকিয়ে দেখে দু'জন লোক চেয়ারে বসে খাবার খাচ্ছে। এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

—শিশুটি খুবই সুন্দর।

—মায়ের অবস্থা তো সহ্য করার মত নয়। বেচারী সব ডাক্তারের পায়ে পড়ছে।

—আমরা তো সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি।

—বাঁচবে বলে মনে হয় না।

—আমি তো ওর মাকে বলেছি, দোয়া করো বোন।

একজন ডাক্তার সেজদায় পড়ে থাকা মমতাজের দিকে তাকিয়ে বললো, আরে তুই কি করছিস? এদিকে আয়।

মমতাজ উঠে উভয় ডাক্তারের কাছে গেল। একজন জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

মমতাজ শুক ঠোঁটে জিহ্বা ফিরিয়ে বলল, আমি একজন রুগী।

ডাক্তার রুক্ষস্বরে বললো, রুগী হলে ভেতরে যাও, এখানে কি করছ?

মমতাজ বললো, জী, আমার সন্তান ঐ ওয়ার্ডে।

—ওহো, তোমারই সন্তান যে কিনা—

—জী, আপনারা সম্ভবত ওর কথাই বলছেন। ও আমার ছেলে, খালেদ।

—আপনি ওর পিতা ?

মমতাজ মাথা নাড়লো। মুখে বললো, জী হঁা, আমি ওর পিতা।

ডাক্তার বললো, আপনি এখানে বসে আছেন? ভেতরে যান, আপনার স্ত্রী খুবই উদ্বিগ্ন।

—জী আচ্ছা।—বলে মমতাজ ওয়ার্ডের দিকে পা বাড়ালো। সিঁড়ি বেয়ে উপরে পৌঁছে দেখলো তার চাকর ছেলেটা কাঁদছে। মমতাজকে দেখে আরো জোরে কেঁদে উঠলো। বললো, সাহেব, খালেদ মিয়া মরে গেছে।

মমতাজ ভেতরের কামরায় গেল। তার স্ত্রী সংজ্ঞাহীনা হয়ে পড়ে আছে। একজন ডাক্তার নার্স সহ তার জ্ঞান ফিরাতে চেষ্টা করছে। মমতাজ পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। খালেদ চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে, তার চোখে-মুখে মৃত্যুর প্রশান্তি। মমতাজ শিশুর রেশমী চুলে হাত বুলিয়ে মনে মনে জিজ্ঞেস করলো, খালেদ মিয়া, আপনি দুধ খাবেন ?

খালেদ না-সূচক ঘাড় নাড়লো। মমতাজ আবেদনের সুরে বললো, খালেদ মিয়া, আমার খেয়ালীপনা নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবেন ?

মমতাজের মনে হলো, খালেদ যেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করেছে।

●

গ্রন্থসার

শীতের সকালে আনোয়ার মাচার উপর ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। তার সাথে তার এক ভাগনে রয়েছে। আনোয়ারের আব্বা বাইরে গেছেন, তার ফিরতে দেরী হবে এজন্যে পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে সে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ইচ্ছামতো সে সুতো ছাড়ছে। আনোয়ারের ভাগনের ছোট বুক ধুক ধুক করছে। এতো সুতো ছাড়তে দেখে সে অপলক চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে, মামা, সুতো টেনে নিন। কিন্তু আনোয়ার সে কথায় কান দিচ্ছে না।

নীচের খোলা বারান্দায় আনোয়ারের বোন বান্ধবীদের সাথে রোদ পোহাচ্ছে এবং কাপড়ে ফুল তুলছে। মাঝে মাঝে কথা বলছে। আনোয়ারের বোন শামীম তার চেয়ে দু'বছরের বড়। নানা রকম ফুল তুলতে এবং সেলাই-এর কাজে সে বিশেষ পারদর্শিণী। আশেপাশের অনেক মেয়ে এজন্যে তার কাছে এসে এসব কাজ শিক্ষা করতো। দূরত্ব সত্বেও প্রতিদিন যথাসময়ে নিয়মিত আসতো। এবং মনোযোগের সাথে নতুন ডিজাইনের কাজ শিক্ষা করতো।

বিমলার বাবা একজন স্কুল শিক্ষক। শৈশবে তার মা মারা যায়। বিমলার বাবা লালা হরিচরণ ইচ্ছে করলে সহজেই আর একটা বিয়ে করতে পারতো, কিন্তু বিমলার প্রতি আত্যন্তিক স্নেহ পরবশ হবার কারণে তিনি বিয়ে করেননি। গভীর মায়ামমতা ও যত্ন সহকারে তিনি বিমলাকে লালন-পালন করেন। বর্তমানে বিমলার বয়স ষোল বছর। শ্যামলা রঙের হালকা পাতলা গঠনের মেয়ে। প্রায়ই চুপচাপ থাকে, খুবই কম কথা বলে। লাজুক প্রকৃতির। সকাল দশটায় আনোয়ারদের বাড়ীতে এসে আপা শামীমকে প্রণাম জানিয়ে থলে খুলে কাজ করতে শুরু করে।

আনোয়ারের বয়স আঠারো। সব মেয়েদের মধ্যে শুধু সাঈদার সাথেই তার কিছুটা আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু এ আন্তরিকতা তার

বড় বোনের কারণে গাঢ় হতে পারেনি। কারণ তার বড় বোন তাকে মেয়েদের মধ্যে বসার অনুমতি দিত না। কখনো তাদের কাছে এসে যদি আনোয়ার কিছুক্ষণের জন্যে বসতো, সঙ্গে সঙ্গে শামীম বলতো, আনোয়ার উঠে যাও, এখানে তোমার কোন কাজ নেই। আনোয়ারকে এ আদেশ পালন করতেই হতো।

বিমলা অবশ্য আনোয়ারের কাছে নভেল নেয়ার জন্যে আসতো। শামীমকে সে বলেছিল, বাড়ীতে মন বসে না, পিতাজী সতরঞ্জ খেলতে চলে যান। আমি একা একা পড়ে থাকি। আনোয়ার ভাইকে বলবেন আমাকে যেন পড়ার জন্যে দু'একটা নভেল দেয়।

প্রথমে বিমলা শামীমের মাধ্যমে নভেল গ্রহণ করতো। কিছুদিন পর সরাসরি আনোয়ারের কাছ থেকে বই চাইতে শুরু করলো। বিমলাকে আনোয়ারের মনে হতো এক বিস্ময়কর মেয়ে। এমন মেয়ে যে কিনা গভীর দৃষ্টিতে তাকালে পরে চোখে পড়ে। মেয়েদের উচ্ছলতায় সে থাকে অনুপস্থিত। আনোয়ারের ঘরে নভেল চাইতে এলে আনোয়ার বুঝতে পারতো যে বিমলা এসেছে। তার আগে নয়। কাছে এসে বিমলা বলতো, আনোয়ার সাহেব, এই নিন আপনার নভেল। ধন্যবাদ!

বিমলার দিকে তাকালে আনোয়ারের মনে সন্দেহ জাগ্রত হতো। তার মনে হতো এ মেয়ে তো ঠিক বইয়ের সারকথার মতো।

বিমলা অন্য কোন কথা বলতো না। পুরনো নভেল ফিরিয়ে দিয়ে নতুন নভেল নিত এবং নমস্তে বলে চলে যেতো। আনোয়ার তার সম্পর্কে কিছুক্ষণ ভাবতো, তারপরই ভুলে যেত সব। তবে আনোয়ার অনুভব করেছিল যে, বিমলা দু'একবার তার কাছে কিছু যেন বলতে চেয়েছে। কিন্তু বলতে বলতে থেমে গেছে। আনোয়ার ভাবতো, ও আমার কাছে কি বলতে চায়? নিজের মনেই সে জবাব পেতো, কিছুই না, আমার কাছে ও আবার কি বলবে?

আনোয়ার মাচার ওপর ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। সুতো প্রচুর পরিমাণে ছেড়েছে। হঠাৎ তার বোন শামীম তাকে ভয়ার্তভাবে বললো, আনোয়ার, আনোয়ার—আব্বাজী এসেছেন।

আনোয়ার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। ঘুড়ি ছেড়ে দ্রুত নীচে নেমে এলো। 'কেটে গেল! কেটে গেল!' শব্দ উঠলো। আনোয়ারের ঘুড়িও হাতছাড়া হলো আবার হাঁটুতে সে চোট পেলো। একদিকে শারীরিক ব্যথা, অন্যদিকে শত্রুদের বিজয় উল্লাস। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে বারান্দায় এসে বসলো। হাঁটুর দিকে তাকিয়ে দেখলো, রক্ত ঝরছে। সামনে বিমলা বসেছিল, সে নিজের ওড়নার এক পাশ থেকে কিছুটা ছিঁড়ে আনোয়ারের হাঁটুতে পট্টির মতো বেঁধে দিল। আনোয়ার তখন তার ঘুড়ির কথা ভাবছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সে জয়ী হবে, কিন্তু তার আব্বার অসময়ে আগমনের ফলে এতো উর্ধ্বগামী ঘুড়িটা ছেড়ে দিতে সে বাধ্য হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিজয়ধ্বনি তখনো শোনা যাচ্ছিল। রাগতস্বরে সে বললো, আব্বাজীকে এখনই আসতে হলো!

শামীম হাসলো।—কখন এলেন তিনি?

আনোয়ার চীৎকার করে বললো, কি বললে?

শামীম হেসে বললো, আমি তো রসিকতা করেছিলাম।

আনোয়ার ক্রোধে ফেটে পড়লো।—আমাকে জখম করে দিয়ে আপনি হাসছেন? চমৎকার রসিকতা তো। একদিকে এতো বড় একটা ঘুড়ি গায়েব হলো, অন্যদিকে ছেলেদের গঞ্জনা শুনলাম, তদুপরি হাঁটু জখম হলো।

এই বলে আনোয়ার তার হাঁটুর দিকে তাকালো। সাদা মলমলের পট্টিবাঁধা। হঠাৎ তার মনে পড়লো যে, বিমলা ওড়না ছিঁড়ে তাকে পট্টি বেঁধে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে সে বিমলার প্রতি তাকালো এবং অনুভব করলো যে, বিমলাই যেন তার ব্যথা অনুভব করছে।

বিমলা হঠাৎ শামীমকে বললো, আপা, আপনি বড় জুলুম করেছেন। বেশী আঘাত পেলে কেমন হতো?—আরো কিছু যেন সে বলতে চাইলো, কিন্তু বলতে পারলো না। নিজের কাজে মনোযোগ দিল।

বিমলার উপর থেকে আনোয়ারের দৃষ্টি সাঈদার উপর গিয়ে পড়লো। সাদা পুলওভারে ওকে খুব সুন্দর লাগছে। আনোয়ার সাঈদার দিকে তাকিয়ে বললো, সাঈদা তুমিই বল, এরকম রসিকতার কোন

মানে হয়? হাসিতে যদি ফাঁসী হয়ে যেতো তখন?

শামীম তাকে শাসনের সুরে বললো, যাও আনোয়ার, তোমার এখানে কোন কাজ নেই।

আনোয়ার সাঈদার দিকে এক নজর তাকিয়ে 'আচ্ছা তাই' বলে উঠে গেল এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাচার উপর আরোহণ করলো। ঘুড়ি উড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সুতো টেনে প্রতিপক্ষের প্রায় এক ডজন ঘুড়ির সুতো কেটে নীচে নেমে এলো। হাঁটুতে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। সে গিয়ে বৈঠকখানার সোফার উপর লেপ গায়ে শয়ন করলো। কিছুক্ষণ যাবত নিজের বিজয় সম্পর্কে ভাবলো, তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মনে হলো কে যেন তাকে ডাকছে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো সামনে বিমলা দাঁড়িয়ে আছে। জড়সড় আড়ষ্ট নিষ্প্রভ ভাব চোখে-মুখে। আনোয়ার শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার বিমলা?

বিমলা বললো, জ্বী, আমি আপনার কাছে কিছু—জ্বী, আমি আপনার কাছে একটা নতুন বই চাইতে এসেছি। একটা নতুন বই দিন।

অনোয়ার বললো, হাঁটুতে খুব ব্যথা। সামনের আলমারী খুলে তোমার পছন্দ মতো একটা বই নিয়ে যাও।

বিমলা কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে, থেকে বললো জ্বী? আনোয়ার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো বিমলার ওড়নার নীচে তার অস্বাভাবিক বুক। মেয়েটির প্রতি আনোয়ারের করুণা হলো। ওর চেহারা, মুখমণ্ডল দেখে আনোয়ার ওর প্রতি সব সময়েই করুণা অনুভব করে। কি বলবে কিছু ভেবে না পেয়ে সে বললো, পট্টি বেঁধে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।

বিমলা কিছু না বলে আলমারীর কাছে গিয়ে বই দেখতে লাগলো। আনোয়ারের আবার মনে হলো, ও তো খুবই সস্তা দামের কাগজে ছাপানো একটি বইয়ের সারমর্ম।

বিমলা আড়চোখে আনোয়ারের প্রতি তাকিয়ে তার প্রতি আনোয়ারকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ বই

দেখার পর একটি বই পছন্দ করলো এবং আলমারী বন্ধ করে আনোয়ারের কাছে এসে বললো, আমি এটি নিয়ে চললাম।

আনোয়ার বিমলার সম্পর্কে ভাবতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সাঈদার সাদা পুলওভার তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সে ভাবলো, পুলওভার পরিধানের পর দেহের ভাঁজ কি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সে সাঈদা ও বিমলার বুকের পার্থক্য চিন্তা করলো। বিমলার বুকের যেন দুধ শেষ হয়ে শুধু পানি বাকি আছে। সাঈদার ঢেউ তোলা চুল মাথার পাশের একটা জখমকে কি সুন্দরভাবে ঢেকে দিয়েছে। ওদিকে বিমলা—ইস বিমলার কি যে কষ্ট, অথচ আনোয়ার জানে না, হতভাগিনী আজও কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলতে পারেনি! কিন্তু সে কি বলতে চায় আমাকে? সম্ভবত ওরকমই ওর স্বভাব। সব সময় এমনভাবে বই চায় যেন সাহায্য চাচ্ছে, আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। সাঈদাকে আজ সাদা পুলওভারে যা সুন্দর মানিয়েছে। প্রলয় সৃষ্টি করেছে। আরে প্রলয় তো সবকিছুর শেষ, আর সাঈদা তো আমার জীবনে কেবল মাত্র শুরু হলো। বিমলা—ও কেমন মেয়ে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওর বাবা তো ওকে নিশ্চয়ই খুব আদর করে, ওর দিকে চেয়েই ওর বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি। সম্ভবত ওদের টাকা-পয়সার টানাটানি, কিন্তু ঘর তো বেশ জমজমাট। সোফাসেট বেশ দামী, বাসার খাওয়া-দাওয়াও নাকি খুব ভাল। সাঈদারা তো এমনিতেই বড়লোক, কি হবে তার কথা ভেবে ভেবে? রাখো—রাখো, সাঈদা যুবতী মেয়ে, অচিরেই বিয়ে হয়ে যাবে। আর আমার পড়ালেখা শেষ করতে কত বছর যে লাগবে খোদাই জানেন। বি. এ., বি. এ.র পরে বিলেত, তারপর মেম? দেখবো, দেখবো—ইস সাদা পুলওভার কি যে ছিল!

আনোয়ারের মাথায় এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ধারণা সৃষ্টি হচ্ছিল। তারপর সে অন্য কাজে মনোনিবেশ করলো।

পরদিন বিমলা এলো না। কিন্তু তার অনুপস্থিতি আনোয়ারের মনে বড় একটা বাজলো না। শুধু দেখলো মেয়েদের মধ্যে সে নেই। পরদিন এলে সবাই বিমলাকে জিজ্ঞেস করলো, গতকাল আসলে না যে?

বিমলাকে আরও নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিলো। সে যেন আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কেউ যেন রাঁদা দিয়ে সবদিক থেকে তাকে ক্ষুদ্র ও হাল্কা করে দিয়েছে। তার শ্যামল বর্ণের চেহারায় অদ্ভুত ধরনের বেদনার ছায়া। প্রশ্ন শুনে বিমলা আনোয়ারের প্রতি তাকালো। আনোয়ার গামলায় পানি দিচ্ছিল। বিমলা বললো, পিতাজী কাল অসুস্থ ছিলেন।

শামীম দুঃখ প্রকাশ করে বললো, কি ব্যথা হয়েছিল তার?

বিমলা আবার আনোয়ারের প্রতি তাকালো। কারণ আনোয়ার ওকে দেখছিল। আনোয়ারের প্রতি দ্বিতীয়বার তাকিয়েই বিমলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, ব্যথা? জানি না কি ব্যথা ছিল। এই বলে বিমলা থলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিজের জিনিসগুলো বের করতে করতে বললো, আমি বুঝতে পারি না।

আনোয়ার পানির কলসী একপাশে রাখতে রাখতে বললো, কোন ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিয়ে নাও।

বিমলা আনোয়ারের দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, ওর রোগ ডাক্তাররা ধরতে পারবে না।

আনোয়ারের মনে হলো বিমলা যেন তাকে বলছে, তার রোগ তুমিই বুঝতে পারো। কিছু বলতে যাবে এমন সময় সাঈদার কণ্ঠ শোনা গেল। সে বিমলাকে বললো, খালুজান-এর কাছে যাও। তিনি অনেক বড় ডাক্তার, হাতের তুড়িতে সবকিছু বলে দেবেন।

সাঈদা হাতের তুড়ি বাজাতে চাইলো, কিন্তু শব্দ হলো না। আনোয়ার তাকে বললো, সাঈদা, তোমাকে দিয়ে হবে না, খামাখা তুড়ি বাজানোর চেষ্টা করো না। সাঈদা লজ্জা পেলো। আজ সে কালো পুলওভার পরিধান করে এসেছে। আনোয়ার ভাবলো, দুষ্টুটাকে সব রঙই মানায়। কিন্তু কয়টা পুলওভার আছে ওর কাছে? সব সময়ে একটা না একটা বদল হতেই থাকে। সোয়েটার, পুলওভারের কমতি নেই। ওর সাথে আমার বিয়ে হলে বেশ মজা হবে। পুলওভার শুধু পুলওভার—বন্ধু-বান্ধবরা জলে পুড়ে মরবে। কিন্তু বিমলাকে আজ এরকম ছাইয়ের স্তূপের মতো লাগছে কেন?

সাঈদা লজ্জিত হয়েছে। কিন্তু তার এ লাজ আমার ভাল লাগে না। তুড়ি বাজানো আমার কাছে বা অন্য কারো কাছে শিখে নাও। তবে আমিই ভালো তুড়ি বাজাতে পারি।

অল্প সময়ে আনোয়ার এসব ভাবলো। সাঈদার কোন জবাব না পেয়ে সে বললো, দেখ, এভাবে তুড়ি বাজায়। এই বলে শব্দ করে সে তুড়ি বাজালো। হঠাৎ তার চোখ বিমলার উপর পড়লো। বিমলার চোখে-মুখে হতাশার কালিমা ছেয়ে আছে। আনোয়ারের মনে সমবেদনা জাগ্রত হলো। বললো, বিমলা, তোমার পিতাজীকে বল, ভাল কোন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে। উনি ছাড়া তোমার আর কে আছেন?

এ কথা শুনে বিমলা কেঁদে ফেললো। জোড়ে ঠোঁট কামড়ে সে কান্নার বেগ দমন করতে চাইলো। তারপরও কান্না থামাতে না পেরে গোসলখানার দিকে ছুটে গেল। সব মেয়ে কাজ ফেলে তাকে অনুসরণ করলো। আনোয়ার ওখানে যাওয়া সমীচীন মনে করলো না। এজন্যে নীচে বৈঠকখানায় চলে গেল। বিমলার সম্পর্কে সে ভাবতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার মন-মগজ সহায়ক হলো না। বিমলার দুঃখ-বেদনার গভীরে সে পৌঁছাতে পারলো না। শুধু এটুকু বুঝলো যে, মা বেঁচে নেই, এটাই বিমলার বড় দুঃখ।

বিকেলে আনোয়ার বোনের কাছে বিমলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তার বোন বললো, জানি না বেচারীর কি দুঃখ। বারবার শুধু বাবার কথা উল্লেখ করে বলে, জানি না তার কি রোগ হয়েছে।

সাঈদা পাশে দাঁড়ানো ছিল। তার আকর্ষণীয় দেহ সৌখিন আনোয়ারের মাথা ঘুরিয়ে দিল। সে নিমেষে বিমলার দুঃখ ভুলে গিয়ে সাঈদার সাথে আলাপ করতে লাগলো। সাঈদা আনোয়ারের প্রতি কোন আগ্রহ দেখালো না, অল্পক্ষণ পরই শামীম আপাকে সালাম জানিয়ে সে চলে গেল।

আনোয়ার বৈঠকখানায় বসে কলেজের কাজ করছিল এমন সময় তার বিমলার কথা মনে পড়লো। কেমন মেয়ে? কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজের ওড়না ছিঁড়ে আমায় পট্টি বেঁধে দিল। আজ

যখন বললাম, পিতাজী ছাড়া তোমার কে আর আছে, অমনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। আমি যখন গামলায় পানি দিচ্ছিলাম তখন কি বুঝে সে বললো যে, তার রোগ কোন ডাক্তার ধরতে পারবে না। এটা সে কি করে বুঝতে পারলো? কেন সে বুঝাতে চাইলো যে, তার রোগ আমিই ধরতে পারবো। কিন্তু আমি কি বুঝবো, কেমন করে বুঝবো? কেন সে আমাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে না? যদি সে আমাকে বলা প্রয়োজন মনে করে, তবে কেন বলছে না? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার দিকে তাকানোর সময়ে তার চোখের দৃষ্টি জলন্ত অঙ্গারের মত লাগছিল কেন? এখন তো আমার মনে হচ্ছে, সে আমার মানসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার ওপর অভিশাপ দিচ্ছে। কিন্তু কেন? যেতে দাও, সাঈদা—হাঁ সেই কালো পুলওভার, সাদা ওড়না,—কিন্তু আমার এভাবে চিন্তা করা উচিত নয়। কে জানে, সে কার? যতকিছুই হোক, মেয়েটি সুন্দরী।

পরদিন বিমলা এলো না। আনোয়ারদের বাড়ীতে সবাই চিন্তিত। সবাই তার পিতার সুস্থতা কামনা করলো। শামীম বিমলাকে খুবই পছন্দ করতো। কারণ মেয়েটি বুদ্ধিমতী এবং চাপা স্বভাবের। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কথা ও নিমেষে বুঝে ফেলে। এজন্যে শামীম ওর কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। আনোয়ারের মা আনোয়ারকে বিমলার পিতার অবস্থা জেনে আসার জন্যে সাইকেলে করে পাঠালো।

আনোয়ার গিয়ে দেখলো একটা চওড়া খাটের ওপর বিমলা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নিঃশ্বাস দ্রুত উঠা-নামা করছে। স্বাভাবিকভাবে ডাকলে সে শুনতে পেল না। উচ্চস্বরে 'বিমলা' বলতেই চমকে উঠলো এবং পাশ ফিরে আনোয়ারকে দেখলো। আনোয়ার নমস্কার জানালে বিমলা তার জবাব দিল। আনোয়ার দেখলো বিমলার চোখের কোণায় অশ্রুর চিহ্ন। মনে হলো, সে কাঁদছিল, তার কান্না তখনো শেষ হয়নি। আনোয়ারকে দেখেও অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করলো না।

তারপর পালঙ্ক থেকে নেমে বিমলা আনোয়ারকে একটা চেয়ার দিল। এবং নিজে বিছানার ওপর বসলো। আনোয়ার কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, ওখানে সবাই চিন্তিত, পিতাজী কোথায়?

বিমলা বললো, পিতা !

আনোয়ার বললো, তাঁর অবস্থা কেমন ?

বিমলা অস্ফুটস্বরে বললো, ভালো।

আনোয়ার বললো, আজ তোমার না যাওয়ায় সবাই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আম্মা আমাকে তোমার পিতার খবর নেয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন। পিতাজী কোথায় ?

বিমলা বললো, সতরঞ্জ খেলতে গেছেন।

আনোয়ার জিজ্ঞেস করলো, তুমি আজ গেলে না কেন ?

—আমি ? বিমলা থেমে গেল। তারপর ধরা গলায় বললো, আমি আর যেতে পারবো না, একটা কাজ পড়ে গেছে।

বিমলা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, গতকাল জানতে পারলাম। জানি না কি ! এই বলে কিছুটা উঠে সে বললো, ঠিক আছে, যাই হয়েছে ঠিক হয়েছে। তারপর সে যেন নিজের মধ্যে হারিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আনোয়ার জিজ্ঞেস করলো, আমি ওদের কি বলবো ?

বিমলা বললো, আর কিছু বলার দরকার নেই। তাদের সবাইকে নমস্কার।

আনোয়ার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। হাতজোড় করে বিমলাকে নমস্কার করলো। বিমলা তার জবাব দিল। কিন্তু আনোয়ার দাঁড়িয়েই রইলো! বিমলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর আনোয়ার তাকে বললো, বিমলা আমার মনে হয়েছিল, তুমি বারবার আমাকে কি যেন বলতে চেষ্টা করেছো। কিন্তু বলতে পারোনি। আমি কি সেটা জানতে পারি ?

বিমলার ঠোঁটে ক্ষতবিক্ষত হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বিমলা আনোয়ারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নীচের সড়কের দিকে তাকিয়ে বললো, যা আমি বলতে পারিনি, তুমি বুঝতে পারোনি, সেটা এখন বলার ও বোঝার অনেক উর্ধ্বে। তুমি যাও, আমি এখন শোব।

আনোয়ার চলে এলো। বিমলা আর কোনদিন তাদের বাড়ীতে আসেনি।

প্রায় দশমাস পর সংবাদপত্রে এ চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হলো যে, বড় রোডের ড্রেন থেকে একটা মৃত নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। সন্ধান করে জানা গেল যে, শিশুটি স্কুল শিক্ষক লালা হরিচরণের মেয়ে বিমলার গর্ভজাত, আর শিশুর পিতা স্বয়ং লালা হরিচরণ। সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

আনোয়ার ভাবলো সমগ্র গ্রন্থের এই তাহলে সারমর্ম!

●

নগ্ন আওয়াজ

ভুলু ও গামা দুই ভাই। খুবই পরিশ্রমী। ভুলু কুলিগিরি করতো। একটা টুকরি মাথায় নিয়ে, সারাদিন এখানে-সেখানে কুলিগিরি করতো। বিকেলে ঘরে ফিরে এলে দেখা যেতো তার কোঁচার গিঁটে তিন-চার টাকা জমা হয়েছে।

গামা খাঞ্চা বিক্রি করতো। সারাদিনের ফেরী কাজেতি ন-চার টাকা উপার্জন হতো। কিন্তু তার মদের নেশা ছিলো। রাতে দীনার হোটেলে খাবার আগে তাকে এক পোয়া মদ খেতেই হতো। সবাই জানতো যে সে পান করে আর এভাবেই বেঁচে থাকে।

ভুলু, গামার দু'বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ। গামাকে সে অনেক করে বোঝালো যে, মদাসক্ততা খুবই খারাপ জিনিস। বিয়ে করেছ, অযথা কেন টাকা নষ্ট করছ? এক পোয়া মদের জন্যে যে টাকা খরচ করছ সে টাকা জমা করলে ভাবী ভালভাবে থাকতে পারে। ছেলে-মেয়েগুলোর কাপড়-জামা নেই, অথচ তুমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছ না। গামা এক কান দিয়ে শুনতো, অন্য কান দিয়ে বের করে দিতো। ভুলু বিরক্ত হয়ে বলা-কওয়া ছেড়ে দিল।

উভয়ে ছিল উদ্বাস্তু। একটা বড় বিল্ডিং-এর সাথে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে অনেকের মতো দু'ভাইও থাকতো। দোতলায় অবস্থিত এ কোয়ার্টারে তারা শীতকাল ভালভাবেই কাটালো। গ্রীষ্মকাল এলে দারুণ অসুবিধে দেখা দিল। ভুলু একটা খাট পেতে শুয়ে থাকতো। গামার অসুবিধে মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। স্ত্রী রয়েছে অথচ পর্দার কোন ব্যবস্থা করতে পারছে না। শুধু গামারই একার অসুবিধে নয়, কোয়ার্টারে অন্য যারা বিবাহিত রয়েছে প্রত্যেকেরই ছিল একই অবস্থা।

কুঞ্জনের মাথায় এক বুদ্ধি এলো। সে এককোণে নিজের ও স্ত্রীর তক্তপোষের পাশে চটের পর্দা লাগিয়ে দিল। তার দেখাদেখি

অন্যরাও এভাবে পর্দার ব্যবস্থা করলো। ভুলু ভাইয়ের সাহায্য করলো এবং বাঁশ গেড়ে চটের পর্দা লাগিয়ে দিল। এতে করে বাতাস বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু নীচে কোয়ার্টারের জাহান্নাম থেকে অনেক ভালো।

উপরের কামরায় শোয়ার পর ভুলুর মনে এক আজব পরিবর্তন দেখা দিল। সে বিয়ে-সাদীর সপক্ষে ছিল না। মনে মনে সে সংকল্প করেছিল যে এ আপদ কখনো গলায় ঝুলাবে না। গামা তাকে বিয়ের কথা বললে সে বলতো, না ভাই, এ আমার পোষাবে না। আমি উপদ্রব বাড়াতে চাই না।

গ্রীষ্মকাল এলে উপরে কয়েকদিন খাট বিছানোর পরই তার মনোভাব পরিবর্তিত হলো। একদিন বিকেলে দীনার হোটেলে সে তার ভাইকে বললো, আমাকে বিয়ে দিয়ে দাও, না হলে আমি পাগল হয়ে যাব।

গামা এ কথা শুনে বলল, একি রসিকতা করছো?

ভুলু গম্ভীরভাবে বলল, তুমি জান না, পনেরদিন থেকে আমি ঘুমুতে পারছি না।

গামা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কেন?

ভুলু বলল, আরে কি আর বলব, ডানে-বামে যেদিকে তাকাই কিছু না কিছু হচ্ছে। অদ্ভুত ধরনের শব্দ শোনা যায়। কি ঘুমোবো ছাই!

গামা ঘন গোঁফের আড়ালে সশব্দে হেসে উঠল। ভুলু বলল, কুল্লন শালা তো মাৎ করে দিয়েছে। সারারাত শুধু কথা বলে। স্ত্রীর অবস্থাও তথৈবচ। বাচ্চা পড়ে কাঁদছে, কিন্তু ওরা—

অভ্যাসমাফিক গামা নেশায় চুর হয়ে আছে। ভুলু দীনার হোটেলে গিয়ে চেনা-পরিচিত সবাইকে শুনিয়ে বলল, তার ভাইয়ের ইদানীং ঘুম হচ্ছে না। তার বিশেষ বর্ণনাভঙ্গিতে সবাই হেসে লুটোপুটি খেল। ভুলুর সাথে দেখা হলে ওরা ঠাট্টা মস্করা করল। কেউ জিজ্ঞেস করল, হাঁ ভাই, কুল্লন তার স্ত্রীর সাথে কি কি কথা বলে? কেউ বলল, মিয়া মুফত মজা লুটছ, সারারাত সিনেমা

দেখছ, গান ও নাচ সবই শুনছ!

কেউ কেউ আরো অশ্লীল রসিকতা করল। ভুলু রেগে গেল। গামাকে বলল, তুমি তো দেখি আমাকে উপহাসের পাত্র বানিয়ে দিয়েছ। দেখো আমি যা বলেছি, মিথ্যে বলিনি। সত্যি আজ বিশ দিন হলো, আমি ঘুমুতে পারছি না। তুমি শিগগীর আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও, না হলে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। ভাবীর কাছে আমার পাঁচশ' টাকা জমা আছে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো।

গামা গোঁফে তা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ঠিক আছে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমার ভাবীর সাথে আজই আলাপ করছি। সে চেনা-জানা সবার সাথে আলাপ করবে।

দেড় মাসের মধ্যে কথাবার্তা পাকাপাকি হলো। কুলির সর্দার সামাদের মেয়ে আয়েশাকে ভুলুর স্ত্রী পছন্দ করল। মহল্লাবাসীরা ওদের মান্য করত। এদিকে ভুলু কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান। জুনের মাঝামাঝি সময়ে বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হলো। সামাদ আপত্তি করল যে, এতো গরমের মধ্যে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কিন্তু গামার পীড়াপীড়িতে অবশেষে রাজী হলো।

বিয়ের চারদিন আগে ভুলু তার নববধূর জন্য উপরের কামরায় চটের পর্দার ব্যবস্থা করল। বাঁশ গেড়ে পর্দা ভালভাবে বাঁধল, নতুন বিছানা পাতল, সোরাহী গ্লাস ক্রয় করে আনল। রাতে সে পর্দাঘেরা তক্তপোষে শোবার পর তার অদ্ভুত মনে হলো। উন্মুক্ত বাতাসে ঘুমুতে অভ্যস্ত ভুলুকে নতুন অভ্যাস রপ্ত করতে হলো। এ কারণেই বিয়ের চারদিন আগে থেকে সে ওখানে ঘুমুতো। প্রথম রাত শুয়ে স্ত্রীর কথা ভেবে ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে গেলো। তার কানে ভেসে আসা রকমারি শব্দের সাথে মনে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনার উদয় হলো। ফলে সে ঘুমুতে পারল না। সে ভাবল, আমি কি এ রকম শব্দ সৃষ্টি করব? আশেপাশের লোকেরা কি তার সৃষ্ট শব্দাবলী শুনতে পাবে? ওরাও কি তাহলে তারই মতো বিনিদ্র রাত কাটাবে? কেউ যদি উঁকি দিয়ে দেখে তাহলে কেমন হবে?

ভুলু আগের চেয়ে বেশী আনন্দিত হয়ে উঠল। সে ভেবে বিব্রত

হচ্ছিল যে, চটের পর্দাও আবার পর্দা নাকি? চারদিকে লোকজন ছড়িয়ে আছে। রাতের নীরবতায় ফিস ফিস করে বলা কথাও অন্যের কানে পৌঁছে যায়। মানুষ কিভাবে এ নগ্ন জীবন কাটায়? একটা কামরা, তাতে একটা মাত্র তক্তপোষে স্বামী-স্ত্রী শুয়ে আছে। অসংখ্য চোখ। অগণিত কান আশেপাশে খুলে আছে। সরাসরি না দেখলেও সবই দেখা যায়। সামান্য একটা শব্দ পুরো ছবি সামনে এনে হাজির করে। এ চটের পর্দাও কি একটা পর্দা! সূর্যোদয়ের পর সবকিছু প্রকাশ্যে দৃষ্ট হয়। সামনে কুল্লন তার স্ত্রীর বুক টিপছে, ও-পাশে তার ভাই গামা ঘুমিয়ে আছে। তহবন্দ একপাশে খুলে পড়েছে। এদিকে ইদু হালুয়াইর কুমারী মেয়ে শাঙ্গার পেট উঁকি দিচ্ছে।

বিয়ের দিন এলে ভুলুর মন চাইল কোথাও পালিয়ে যায়। কিন্তু যাবে কোথায়? এখন তো সে বাঁধা পড়ে গেছে। পালিয়ে গেলে সামাদ নির্ঘাত আত্মহত্যা করে বসবে। তার মেয়ে যে কি করবে, কি হৈ-চৈ যে শুরু হবে, সে আর বলার নয়।

ভুলু নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলল, যা হবার হতে দাও। আমার সঙ্গে আরো লোকজন তো রয়েছে। আস্তে আস্তে আমারও অভ্যাস হয়ে যাবে। এসব ভেবে ভুলু বৌকে ঘরে এনে তুলল।

কোয়ার্টারে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সবাই ভুলু ও গামাকে অভিনন্দন জানাল। ভুলুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা প্রথম রাতের জন্যে কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিল। কিন্তু ভুলু নীরবে সবকিছু শুনল। তার ভাবী তাদের উপরের কামরায় পৌঁছে দিতে চাইল। গামা মোতির মালা বালিশের কাছে রাখল। ভুলুর এক বন্ধু দুধ-জিলিপি রেখে গেল। ভুলু বৌয়ের কাছে দীর্ঘক্ষণ বসে রইল। বেচারা লজ্জায় ঘোমটা টেনে লাল হয়ে উঠল। প্রচণ্ড গরম। ভুলুর নতুন জামা তার গায়ের সাথে সেঁটে গেছে। পাখা চলছে, কিন্তু বাতাস একদম গায়েব। ভুলু ভাবল, সে উপরে যাবে না, নীচেই রাত কাটাবে। কিন্তু গরমের প্রকোপে টিকতে না, পেরে বৌকে বলল, চল উপরে যাই।

রাত অর্ধেক কেটে গেছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভুলু ভাবল, চটের পর্দার ভেতর বৌকে নিয়ে প্রবেশ করে আঁধার থাকতেই আবার নীচে নেমে আসবে।

উপরে গিয়ে ভুলু দেখল চারদিকে নীরবতা ছেয়ে আছে। লাজনম্র নববধূর পায়ে ঘুঙুর ধ্বনি বাজছে। হঠাৎ ভুলু অনুভব করল চারদিকের ঘুমিয়ে থাকা লোকগুলো যেন একত্রে তাদের দিকে ঠিকরে তাকিয়েছে। তক্তপোষে পার্শ্ব পরিবর্তনের শব্দ শোনা গেলে কাশি, গলা খাঁকারি শুরু হলো। ভুলু বৌর হাত ধরে দ্রুত পর্দার ভেতরে চলে গেলো। চাপা হাসির শব্দ তার কানে এসে আঘাত করল। তার ভয় বেড়ে গেল। স্ত্রীর সাথে কথা বলতেই আশে-পাশে ফুসুর ফুসুর শুরু হলো। কুল্লনের তক্তপোষ সচল হলো। সে শব্দ কানে এলে গামার তক্তপোষের স্পন্দন বেড়ে গেল। ইদু হালুয়াইর কুমারী মেয়ে শাঙ্গা দু'-তিন বার উঠে পানি খেলো। কলসের সাথে গ্লাসের ধাক্কায় এক ধরনের শব্দ হতো। খিরে কসাই-এর ছেলের তক্তপোষ থেকে বারবার দিয়াশলাই জ্বালানোর শব্দ হচ্ছিল।

ভুলু নববধূর সাথে কোন কথা বলতে পারল না। সে ভাবল, আশেপাশের খোলা কানগুলো তার কথা সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলবে, এবং সবার কানে তা ছড়িয়ে যাবে। দম বন্ধ করে সে পড়ে রইল। মাঝে মাঝে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখে বেচারী গুটিসুটি মেরে একটি পুটলির মতো শুয়ে থেকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভুলু ঘুমুতে চাইল। কিন্তু ঘুম এল না। কিছুক্ষণ পর পরই তার কানে শব্দ ভেসে আসছিল। সেসব শব্দাবলী মুহূর্তে তার চোখের সামনে ছবি হয়ে ভেসে উঠছিল। তার মনে অস্থিরতা খেলা করছে। বিয়ের ইচ্ছে করার পর কতো অজানা আনন্দ তাকে বিব্রত করছিল। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও একটা আমেজ ছিল, কিন্তু এখন যেন সবই উবে গেছে। কয়েকবার সে রোমাঞ্চিত স্মৃতিতে ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু আশপাশের বিচিত্র শব্দাবলী সব

এলোমেলো করে দিচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল সে নগ্ন হয়ে পড়ে আছে। একদম নগ্ন।

চারদিক থেকে সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে আর চিবিয়ে চিবিয়ে হাসছে।

ভোর চারটার দিকে উঠে ভুলু বাইরে বেরুলো এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান করায় মনের অস্থিরতা কিছুটা কেটে গেল। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভুলু তাকিয়ে দেখল চটের পর্দা সরে গিয়ে কুদ্দুনের তক্তপোষ দেখা যাচ্ছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী বিলকুল নগ্ন হয়ে ঘুমুচ্ছে। ভুলুর দারুণ ঘৃণা হলো। সাথে সাথে নিজের উপর রাগও হলো যে, এ রকম কামরায় কেন ওরা থাকছে? থাকলেও চটের পর্দা কেন ঝুলাচ্ছে? তার মন চাইল সব পর্দা ছিঁড়ে ফেলে নগ্ন হয়ে নাচতে শুরু করে।

ভুলু নীচে নেমে এলো। কাজে গেলে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা হলে ওরা তাকে প্রথম রাতের অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করল। ফুজু দর্জি দূরে থেকেই বলল, কি ওস্তাদ ভুলু, কেমন কাটল? আমাদের নামে কালিমা লাগিয়ে দাওনি তো আবার!

টিন বিক্রেতা দাগে বলল, দেখো, যদি কোন গোলমাল থাকে আমাকে বল, একটা চমৎকার তদবির আছে আমার কাছে।

ঝলি তার কাঁধে থাপ্পড় দিয়ে বলল, কি পালোয়ান, কেমন চললো?

ভুলু কোন কথা বলল না।

সকালে তার স্ত্রী শ্বশুরালয়ে চলে গেল। পাঁচ-ছ'দিন পর ফিরে এলে তাকে একই বিপদের সম্মুখীন হতে হলো। কামরায় অন্য যারা শুয়েছিল, তারা যেন তার বৌর আগমনেরই প্রতীক্ষায় ছিল। উপরে শোয়ার পর সেই একই ফুস্সুর ফুস্সুর, একই চর্চা-হাসি মস্করা-কাশি, পানির কলসটার সাথে গ্লাসের ধাক্কার শব্দ, ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন, চাপা হাসি।

ভুলু সারারাত শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটাল! মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, আমার কি হয়েছে, এ আমার কি হলো?

সাত রাত পর্যন্ত এ অবস্থা চললো। শেষে বিরক্ত হয়ে ভুলু বৌকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিল।

বিশ-পঁচিশ দিন কেটে গেলে গামা ভুলুকে বলল, তুমি বড় আজব মানুষ দেখছি, নতুন বিয়ে করে বৌকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিলে, রাতে একাকী তোমার ঘুম হয় কি করে?

ভুলু শুধু বলল, ঠিক আছে।

গামা বলল, ঠিক আছে অর্থ কি? আয়েশাকে তোমার কি পছন্দ হয়নি?

ভুলু বলল, না, তা নয়।

গামা বলল, তবে কি হয়েছে?

ভুলু এড়িয়ে গেল।

কয়েকদিন পর তার ভাই আবার কথা তুলল। ভুলু উঠে কোয়ার্টারের বাইরে চলে গেল।

একটা তক্তপোষে বসলে তার ভাইয়ের কণ্ঠ শোনা গেল। ভাবীকে তার ভাই বলছে, তুমি যে বলছ আয়েশাকে ভুলুর পছন্দ হয়নি, এটা ঠিক নয়।

গামার স্ত্রী বলল, তবে আর কি হতে পারে? আয়েশার প্রতি ভুলুর কোন আকর্ষণ রয়েছে বলে তো মনে হয় না।

গামা বলল, কি রকম?

গামার স্ত্রীর জবাব ভুলু শুনতে পেল না। তবু সে আন্দাজ করল, তার সমগ্র অস্তিত্বকে যেন গরম উনুনে ভাজা করছে। গামা হঠাৎ চীৎকার করে বলল, না না,—এ তোমাকে কে বলেছে?

গামার স্ত্রী বলল, আয়েশা তার এক বান্ধবীর কাছে বলেছে, সেটা আমার কানে এসে পেঁŏছেছে।

গামা দুঃখভরা কণ্ঠে বলল, এ তো খুব খারাপ হলো।

ভুলু মনে মনে মরে গেল। তার বুকে যেন ছুরি বিদ্ধ হলো। তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল।

উঠে গিয়ে সে সব চটের পর্দা ছিঁড়ে ফেলল। খট খট খট খট শব্দ শুনে আশেপাশের সবাই জড় হলো। তারা তাকে বাধা

দিল, কিন্তু ভুলু কিছু শুনল না। তর্কবিতর্ক চরমে পৌঁছালে কুল্লন একটা লাঠি উঠিয়ে ভুলুর মাথায় আঘাত করল। ভুলু সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

এখন সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বাজারে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও চটের পর্দা টাঙ্গান দেখলে টেনে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

●